একক ৩ ❑ ক্ষতিপূরণ-মহামন্দা-অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ ক্ষতিপূরণ সমস্যা

৩.২.১ বল প্রয়োগের পর্ব

৩.২.২ আপোষ মীমাংসা পর্ব — আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণ

৩.২.৩ ব্যর্থতার পর্ব

৩.২.৪ আন্তর্জাতিক তাৎপর্য-ফরাসি-জার্মান সম্পর্কের ক্ষতিপূরণ সমস্যার প্রভাব

৩.৩.১ মহামন্দা

৩.৩.২ মহামন্দার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

৩.৪.১ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ

৩.৪.২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

৩.৪.৩ জার্মানি

৩.৫ সারাংশ

৩.৬ অনুশীলনী : প্রশ্নাবলি ও উত্তরসংকেত

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- জার্মানি ও ক্ষতিপূরণ সমস্যা
- ১৯২৯ সালের মহামন্দা
- অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ

৩.১ প্রস্তাবনা

ভার্সাই চুক্তির শর্ত অনুসারে রাজনৈতিক ও ভৌমিক পুনর্গঠনের প্রশ্নগুলির সাময়িক হলেও ক্ষতিপূরণ সমস্যাটির দ্রুত মীমাংসা ছিল প্রায় অসম্ভব। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, ক্ষতিপূরণ দানের পদ্ধতি, কিস্তির সংখ্যা, সময়কাল ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নের এক মত হতে মিত্র পক্ষের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছিল। এছাড়া, ক্ষতিপূরণ আদায়ের উদ্দেশ্য সম্পর্ক ফ্রান্স ও ইংলন্ডের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল।

ক্ষতিপুরণের প্রশ্নের সঙ্গে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ঋণের সমস্যাটি জড়িত হয়ে আরও জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। মিত্রপক্ষ ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়েই যুদ্ধকালীন ঋণ শোধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজি হয়নি।

জার্মানি প্রথম দিকে মার্কিন ঋণের টাকায় ক্ষতিপূরণ দেবার চেষ্টা করলেও ওয়াল স্ট্রীটে শেয়ার বাজারে ধস্‌কে কেন্দ্র করে যে মহামন্দার (Great Depression) সূচনা হয় তা পৃথিবীর বৃহত্তম উত্তমর্ণ রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে বিপন্ন করে তোলে। এই সংকটের ঢেউ গিয়ে লাগে গোটা পৃথিবীর অর্থব্যবস্থায়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাহায্যে একমাত্র সোভিয়ত ইউনিয়ন এই সংকট এড়াতে পেরেছিল।

এদিকে মহামন্দা এবং অন্যদিকে জার্মানিতে ক্রমবর্ধমান দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা ক্ষতিপূরণ দেবার পুরো আবহাওয়া পাল্টে দেয়। বিশ্বের প্রতিটি দেশ পারস্পরিক অর্থনৈতিক আদান প্রদানের পরিবর্তে অর্থনৈতিক জাতীয়বাদের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যে সময় উদার উন্মুক্ত বাণিজ্যিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক আস্থার মনোভাব ফিরিয়ে আনতে পারত সেই সময় অর্থনৈতিক জাতীয়বাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রত্যেককে বিচ্ছিন্ন করে তোলে। এই অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবাদ শান্তিরক্ষার অনুকূল ছিল না।

৩.১ ক্ষতিপূরণ সমস্যা

প্যারিসের শান্তিচুক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জনিত সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সূচিত করেনি—সমাধানের সূত্রপাত করেছিল মাত্র। ক্ষতিপূরণ (reparation) দেওয়ার প্রশ্নটি প্যারিসে অমীমাংসিতই থেকে গিয়েছিল।

পরাজিতের কাছ থেকে যুদ্ধের পুরো ব্যয়ভার আদায় করা বিজয়ীর সর্বজনস্বীকৃত অধিকার। এই অধিকারের সঙ্গে যুদ্ধ সংঘটনের নৈতিক বা আইনগত দায়িত্বের প্রশ্ন জড়িত নয়। পরাজিত জার্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, কারণ জার্মানি যুদ্ধ-অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিল। চাপে পড়ে যুদ্ধ সংঘটনের দায়িত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হলেও জার্মানরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। প্রথমত, এই দায়িত্ব স্বীকার করার অর্থ, যে জার্মানরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁরা একটি অন্যায্য কারণে প্রাণ দিয়েছেন। এছাড়া, যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষর করে জার্মানি নিজে থেকে যে দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল, তাও অস্বীকার করা হয়। অধ্যাপক কেলর দেখিয়েছেন, জার্মান ক্ষোভের মূল কারণ প্রতীকী। ইতিহাসে প্রতীক অনেক সময় সত্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শান্তিচুক্তির ২৩১ নম্বর ধারায় ক্ষতিপূরণের উল্লেখ ছিল এবং জার্মান প্রতিনিধিরা স্বেচ্ছায় এই ধারা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। জন ফস্টার ডালেসের মতে এই ধারা জার্মানিকে মিত্রপক্ষের অযৌক্তিক দাবি থেকে রক্ষা করে। জার্মানিকে যুদ্ধের নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে নিতে হলেও তাকে বিধিবদ্ধ ভাবে আইনগত ক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়েছিল। কোনও ভাবে এই ধারাটি যুদ্ধ অপরাধ সংক্রান্ত ধারা বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। অপরাধ শব্দটি উল্লেখিত হয়নি। এমন কোনো প্রমাণ দেওয়া যায় না, জার্মানিকে একপাক্ষিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, তুরস্ক ও বুলগেরিয়ার সঙ্গে প্রায় একই ভাষায় চুক্তি করা হয়েছিল। কিন্তু 'যুদ্ধ অপরাধ' সংক্রান্ত ধারার পুরাণকথা (myth)' ২০-র দশকে জার্মান সরকারগুলি বারে বারে উল্লেখ করেছিল এবং হিটলার পরবর্তীকালে কাজে লাগিয়েছিলেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনের মতে, জার্মানি ১৯১৪ সালে বেআইনিভাবে বেলজিয়াম আক্রমণ করেছিল বলে বেলজিয়াম যুদ্ধজনিত অর্থক্ষয়ের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী। কিন্তু বেলজিয়ামের ক্ষেত্রটি অভিনব, অন্যদেশের সঙ্গে এ ব্যাপারে তার কোনো তুলনা চলে না। ১৯১৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি উইলসন ফোর

এড্‌শ বক্তৃতায় (Four Ends Speech) বলেছিলেন, "কোনো বাধ্যতামূলক জরিমানা দিতে হবে না, কোনো শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে না।" ("There shall be ..... no contribution, no punitive indemnities")।

কোনো কোনো মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিদের মতে মিত্রপক্ষের যুদ্ধজনিত অর্থহানির সবটাই জার্মানির পূরণ করা উচিত। অভিজ্ঞ কূটনীতিজ্ঞদের মতে, জার্মানির কাছ থেকে যে পরিমাণ অর্থ দাবি করা হয়েছে আর সে বাস্তবে যে পরিমাণ অর্থ দিতে পারবে তার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। তাছাড়া, জার্মানি যে অর্থহানি পুরোপুরি পূরণ করতে পারবে এই প্রত্যাশা মরীচিকা মাত্র। কিন্তু প্রত্যেক প্রতিনিধিই স্বীকার করেছিলেন যে মিত্রপক্ষীয় বেসামরিক নাগরিকদের যে অর্থহানি হয়েছে, জার্মানি তা পূরণ করতে হবে। ১৯১৮ সালের ৫ নভেম্বর ঘোষিত নির্দেশে এই মর্মে মত প্রকাশ করা হয়।

ভার্সাই চুক্তিতে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত শর্ত ছিল কিন্তু ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি। নীতিগতভাবে স্থির হয়, বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষতি, যুদ্ধবন্দীদের নির্যাতনের জন্য ক্ষতি, বেসামরিক সম্পত্তি ধ্বংসের জন্য ক্ষতি, প্রাক্তন সৈনিকদের প্রদেয় বার্ধক্যভাতা এবং বেসামরিক সম্পত্তি ধ্বংসের জন্য ক্ষতিপূরণ করতে হবে নগদ অর্থে। বাণিজ্য জাহাজ, কয়লা, পশুসম্পত্তি ও অন্যান্য বস্তু ধ্বংসের ফলে যে ক্ষতি, তা পূরণ করতে হবে অনুরূপ বস্তু দিয়ে। যুদ্ধের সময় জার্মানি মিত্রপক্ষের যে ধরনের জাহাজ ধ্বংস করেছে, তা ফিরিয়ে দিতে হবে। সবচেয়ে লাভবান হল ব্রিটেন, ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রপ্য কয়লার অধিকাংশ পেল ফ্রান্স, পশু সম্পত্তি পেল বেলজিয়াম।

জার্মানির সম্পদের ওপর ফ্রান্সের দাবি ছিল দুই ধরনের ঃ উচ্চমানের কয়লার মতো যে পণ্য ফ্রান্সে অমিল অথচ জার্মানিতে যার প্রাচুর্য, সেই কাঁচামাল, দ্বিতীয়ত, এমন নগদ অর্থ যা দিয়ে দ্রতগতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণশোধ করা যাবে। ফ্রান্স জার্মানি থেকে পণ্যগুলিই ক্ষতিপূরণ চেয়েছিল, যেগুলি ফরাসি পণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

ফ্রান্সের দাবির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যুদ্ধফেরৎ সৈনিকদের ভাতা সংক্রান্ত লয়েড জর্জের দাবি। এর ফলে ইংলন্ডের প্রাপ্যের পরিমাণ সবচেয়ে বৃদ্ধি পেত। একের পর এক দাবি মিত্রপক্ষের লোভ বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রতিটি দেশের জনমতকে সন্তুষ্ট করতে দেশনায়কেরা ক্ষতিপূরণের অস্বাভাবিক দাবি উত্থাপন করেন।

মিত্রপক্ষীয় সদস্যরা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে একমত হতে না পারায়, জার্মানির দেয় অর্থ নির্ধারণের জন্য একটি ক্ষতিপূরণে কমিশন (Reparation Commission) গঠন করা হয়। ব্রিটেন,ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইতালি থেকে একজন করে সদস্য এবং জাপান, বেলজিয়াম ও যুগোশ্লাভিয়া থেকে একজন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই কমিশন থেকে সরে যায়। সাধারণত, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম এক দিকে ভোট দিত, ব্রিটেন ও ইতালি অন্য দিকে। সভাপতি হিসেবে ফ্রান্সের একটি অতিরিক্ত ভোট থাকায় তার মতই জয়যুক্ত হত। এই কমিশনের দায়িত্ব ছিল ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং মিত্রপক্ষের হয়ে ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করা। অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত না হওয়ায়, ১৯১৯ সালে জার্মানিকে একটি খালি চেকে সই করতে হয়।

ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে মিত্রপক্ষের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকয় সমস্যাটির সমাধান আরও জটিল হয়ে পড়ে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিশ্ববাণিজ্যের সমৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল ইংলন্ড জার্মানির প্রতি নমনীয় মনোভাব অবলম্বন করতে চেয়েছিল; কারণ, তাহলে জার্মানদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবে না এবং জার্মানিতে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার অটুট থাকবে।

ফ্রান্স বাণিজ্যিক দিক থেকে জার্মান বাজারের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। তবে নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার জন্য ফ্রান্স জার্মানিকে ক্ষতিপূরণের দাবিতে ক্লিষ্ট করতে চেয়েছিল। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর বিরোধিতায় ফ্রান্সের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

ক্ষতিপূরণলব্ধ অর্থের বন্টন নিয়েও মতবিরোধ হয়। ১৯২০ সালে স্পা নামক স্থানে আহুত সম্মেলনে স্থির হয় জার্মানির দেয় ক্ষতিপূরণ থেকে ফ্রান্স পাবে ৫২%, ব্রিটেন ২২%, ইতালি ১০% আর বেলজিয়াম ৮%,। আর বাকি অর্থ ছোট ছোট দেশগুলির মধ্যে ভাগ হবে। বেলজিয়ামের দুর্দশা সবচেয়ে ব্যাপক হওয়ায় তাকে ক্ষতিপূরণ লব্ধ অর্থের ওপর অগ্রাধিকার দেবার অঙ্গীকার করা হয়।

১৯২১ সালে প্যারিস সম্মেলনে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। জার্মানিকে মোট ৬৬,০০,০০০,০০০ পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। জার্মানিকে বছরে ১০০,০০০,০০০ পাউন্ড এবং রপ্তানিলব্ধ অর্থের শতকরা ২৫% দিতে হবে। এর সঙ্গে সংযুক্ত একটি চরমপত্রে বলা হয় যদি ১২ মে-র মধ্যে এগুলি অনুমোদিত না হয় তা হলে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনী রূঢ় উপত্যকা দখল করে নেবে।

ক্ষতিপূরণ সমস্যার সঙ্গে জড়িত আর একটি বিষয় আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণ সমস্যা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিকে প্রচুর পরিমাণে ঋণ দেয়। যুদ্ধশেষে ১৯২২ সালে আমেরিকা মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিকে ঋণশোধের জন্য চাপ দিতে থাকে, কিন্তু মিত্রদেশগুলি যুদ্ধোত্তর সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ঋণ পরিশোধে তাদের অপারগতা ব্যক্ত করে। জার্মানির কাছে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের অর্থ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের পক্ষে যুদ্ধকালীন ঋণ শোধ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু মার্কিন সরকার কোনো মতেই যুদ্ধকালীন ঋণের সঙ্গে যুদ্ধোত্তর ক্ষতিপূরণের প্রশ্নকে যুক্ত করতে চাননি। এইভাবে ক্ষতিপূরণ সমস্যা আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণ সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পদ্ধতির ক্ষেত্রেও বিরাট সমস্যা দেখা যায়। জার্মানি তিনটি উপায়ে ক্ষতিপূরণ দিতে পারত : স্বর্ণ হস্তান্তর করে, পণ্যের মাধ্যমে বা পরিষেবার মাধ্যমে। প্রথমত, স্বর্ণের মাধ্যমে নির্ধারিত অর্থ দিতে গেলে যে বিপুল স্বর্ণভাণ্ডার থাকা প্রয়োজন, তা জার্মানির ছিল না। এছাড়া এই স্বর্ণ হস্তান্তরিত হলে জার্মানিতে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসত। দ্বিতীয়ত, জার্মান অর্থনীতি প্রাক্ বিশ্বযুদ্ধ পর্যায় থেকে অনেক নেমে যাওয়ায় তার পক্ষে পণ্য দ্রব্য সরবরাহ সম্ভব ছিল না। এছাড়া, সমকালীন জার্মানিতে , অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (৩.৪.১ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা আছে।) প্রবল হয়ে ওঠায় পণ্য দ্রব্য সরবরাহ করার মানসিকতাও ছিল না। পণ্য বোঝাই-এর (dumping) ভীতিও ছিল। পরিষেবা দানের তৃতীয় বিকল্প ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রভাব কার্যকর ছিল। জার্মানির বাণিজ্যপোতগুলি অধিগৃহীত হওয়ায় পরিষেবা দানের বাস্তব উপায়ও জার্মানির হাতে ছিল না। শেষে বলা যায় যে কোনো পদ্ধতিতেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক না কেন, ক্ষতিপূরণদাতাকে দরিদ্র করার সঙ্গে সঙ্গে তা ক্ষতিপূরণ গ্রহীতাকেও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করত; জার্মানির পক্ষে অন্য দেশের পণ্য ক্রয় করার ক্ষমতা হ্রাস পেত এবং বিশ্ববাজার সংকুচিত হয়ে পড়ত।

ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধানকে তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করা যায়ঃ প্রথম পর্যায়ে (১৯২২-২৩) বলপূর্বক আদায় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯২৪-১৯২৯) শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ সমস্যার মীমাংসা করার চেষ্টা করা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে (১৯৩০-৩৩) বিশ্বব্যাপী মহামন্দা ও জার্মানিতে নাৎসিবাদের প্রভাববিস্তারের ফলে ক্ষতিপূরণ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

৩.২.১ বলপ্রয়োগের পর্ব (১৯২২-২৩)

ক্ষতিপূরণ কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে জার্মানি ঠিক সময়েই ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে ৫০,০০০,০০০ পাউন্ড মূল্যের কিস্তি দেয়। তিন বছরের মধ্যে এটিই জার্মানির দেওয়া শেষ কিস্তি। কিন্তু যুদ্ধোত্তর জার্মানির অর্থনীতি এই চাপ সহ্য করতে পারেনি। ১৯২০ সাল থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে জার্মান বাজেটে ঘাটতি বাড়তে থাকে।

জার্মান শিল্পপতিরা সুপরিকল্পিত ভাবে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করে। তারা কর ফাঁকি দিয়ে পুঁজি বাইরে পাঠিয়ে ক্ষতিপূরণের বোঝা এড়ানোর চেষ্টা করেন। ফলে সরকারের পক্ষে ক্ষতিপূরণের অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে ওঠে। জার্মান পণ্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে শুল্কের প্রাচীর তুলে দেওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মারফৎ অর্থ সংগ্রহের উপায় জার্মানির হাতছাড়া হয়ে যায়। জার্মান পুঁজি বাইরে যাওয়ায় ও রাজস্ব হ্রাস পাওয়ায় জার্মান বাজেটের ঘাটতি বেড়ে যায়। ফলে কৃত্রিম উপায়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে জার্মান সরকার সাময়িকভাবে সমস্যার সমাধান করে। কিন্তু মার্কের মূল্যহ্রাস, অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি এবং বাজেট ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে জার্মান সরকারের পক্ষে ক্ষতিপূরণ দেওয়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

জার্মানির জীবনে এই মুদ্রাস্ফীতি ভার্সাই চুক্তির চেয়েও বড় বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। সব রকমের আমানত, নির্দিষ্ট সুদভিত্তিক বিনিয়োগ, ব্যাঙ্ক আমানত মূল্যহীন হয়ে পড়ে। মুষ্টিমেয় শিল্পপতি ও ফাটকাবাজরা মুদ্রাস্ফীতির দৌলতে ফুলে ফেঁপে ওঠে। অভিজাত শ্রেণী আগের তুলনায় দরিদ্র হয়ে পড়লেও, তাদের হাতে তখনও জমি, বিষয় সম্পত্তি ও বাসস্থান ছিল। করণিক ও ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধির তুলনায় শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু সবচেয়ে নির্মম আঘাত এসেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর। সঞ্চিত আমানত হারাবার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রমিকের পর্যায়ে নেমে এল। এই অধিকারচ্যুত, মর্যাদাহীন মধ্যবিত্তই ভবিষ্যতে নাৎসিবাদের প্রধান সমর্থক হয়ে উঠেছিল।

জার্মানির অবস্থা বিবেচনা করে ইংরেজ সরকার দু বছরের জন্য জার্মানির দেয় অর্থের স্থগিতাদেশ দেয়। ফ্রনাস ইংলন্ডের প্রস্তাব মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। ফ্রান্সের মতে এই স্থগিতাদেশের সুযোগে জার্মানি দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে। পঁয়কারে স্থগিতাদেশ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতকগুলি শর্ত আরোপ করেন — যেমন ফ্রান্স জার্মানির রং কারখানা ও খনিগুলি অধিকার করে নেবে। একটি তুচ্ছ নিয়মতান্ত্রিক কারণ দেখিয়ে, জার্মানিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়। জার্মানিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ফরাসি ও বেলজিয়ান সৈন্যবাহিনীর রূঢ় আঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে এই অঞ্চলেই জার্মানির ৮০% থেকে ৮৫% কয়লা, ৮০% ইস্পাত ও অশোধিত লৌহ আকর উৎপন্ন হত। বাণিজ্যপণ্য ও খনিজ পণ্যের ৭০% এই অঞ্চল দিয়ে চলাচল করত।

জার্মান সরকার একটি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন ঘোষণা করল। আক্রমণকারীদের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা করতে জার্মানদের নিষেধ করা হল। ক্ষতিপূরণ দেওয়া ও পণ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। জার্মানি অধিকৃত ও অনধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে একটি সীমারেখা টেনে দিল। ফরাসিরা এই সীমানা পেরিয়ে কোনো কিছু পাঠানো নিষিদ্ধ করে একটি পাল্টা বয়কট আরম্ভ করল। ইংরেজ সরকার এ ব্যাপারে ফরাসি সরকারের সঙ্গে কোনো সহযোগিতা করেনি। ফরাসি বাহিনীর উপস্থিতির ফলে জার্মানির অর্থনৈতিক জীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। জার্মান রাজকোষ দেউলিয়া হয়ে পড়ে।

একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন রূঢ় অঞ্চলের সমস্যাকে জটিলতর করে তোলে। ফ্রান্স ও বেলজিয়াম গোটা জার্মানি থেকে দাঙ্গা বাজ মানুষদের রাইনল্যান্ডে জড়ো করে, তাদের অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে একটি

বিচ্ছিন্নতাবাদী রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের গভীর আপত্তি ছিল। রাইন অঞ্চলের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯২৪ সালে ফরাসি সহায্য তুলে নেওয়ায় এই আন্দোলনের অবসান ঘটে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে উভয়পক্ষেরই মানব সম্পদ নষ্ট হয়েছিল। এই আন্দোলনের অর্থনৈতিক ফলাফল ছিল আরও মারাত্মক। ফ্রাঁর মূল্যামান প্রায় এক চতুর্থাংশ ক্ষয় পেয়েছিল। জার্মান মুদ্রা মার্ক প্রায় মূল্যহীন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ফরাসি পক্ষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়, জার্মানির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সামর্থ নেই। জার্মান সরকারও বিনা শর্তে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়। এইভাবে ক্ষতিপূরণের প্রথম পর্বের অবসান ঘটে।

৩.২.২ ক্ষতিপূরণের আপোষ-মীমাংসার পর্ব

ফ্রান্স ও জার্মানি উভয়পক্ষের সুর নরম হওয়ায় ইংলন্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই সমস্যা সমাধানের আবেদন জানায়। ইতিমধ্যে ফ্রান্স ও জার্মানিতে রাজনৈতিক নেতৃত্বেরও পরিবর্তন হয়েছিল। জার্মানিতে গুস্তাভ স্ট্রেসেসম্যান (Gustav Stresesman) (১৮৭৮-১৯২৯) ১৯২৩-২৯ পর্যন্ত জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে পশ্চিমি রাষ্ট্রে সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চান। ফ্রান্সেও ১৯২৪ সালের নির্বাচনে পঁয়কারে মন্ত্রীসভার পতন ঘটে এরিয়র (Herriot) নেতৃত্বে একটি প্রগতিশীল মন্ত্রীসভা কায়েম হয়। এই মন্ত্রীসভা বলপূর্বক শান্তি প্রতিষ্ঠার নীতি চিরতরে পরিত্যাগ করে।

ক্ষতিপূরণ পরিশোধ ঠিক মতো আরম্ভ করার আগে জার্মান অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন ছিল। ১৯২৩ সালের শেষের দিকে মার্কিনী, ব্রিটিশ, ফরাসি, বেলজিয়ান ও ইতালীয় সরকার নিযুক্ত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বাস্তব অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জার্মানির পরিস্থিতি সুবিন্যস্ত করার দায়িত্ব লাভ করে। মার্কিন বিশেষজ্ঞ জেনারাল ডয়েসের নেতৃত্বে ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্যারিসে এই কমিটির কাজ শুরু করে।

ডয়েস কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পেশ করে। (১) জার্মানিতে অর্থনৈতিক ও রাজস্বসংক্রান্ত সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রূঢ় অঞ্চলে থেকে সৈন্য অপসারণ করতে হবে। (২) জার্মানিতে রাইসমার্ক (Reichsmark) নামে একটি নতুন মুদ্রা চালু করতে হবে। একটি ব্যাঙ্ক স্বাধীনভাবে এই মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ করবে। (৩) জার্মানি ৪০,০০০,০০০ পাউন্ড, বিদেশি ঋণ লাভ করবে। (৪) ক্ষতিপূরণের অর্থ সংগৃহীত হবে পরিবহন কর, রেলপথ আমানত, শিল্পগত ডিবেঞ্চার (deventure)* এবং সুরা, চিনি ও তামাক থেকে সংগৃহীত কর থেকে। (৫) জার্মানি মার্কের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেবে — এরপর বিদেশি সরকারগুলি বিদেশি মুদ্রার সঙ্গে মার্কের বিনিময় করে নেবে। জার্মানি অর্থ সংগ্রহের জন্য ঋণপত্র ছাড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণপত্রের অর্ধেকের বেশি ও গ্রেট ব্রিটেন এক-চতুর্থাংশের বেশি কেনে। এই উদ্যোগের সাফল্য পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। (৬) ক্ষতিপূরণ আদায় প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য একজন বিদেশি এজেন্ট জেনারেলকে নিযুক্ত করা হয়। লন্ডন কনফারেন্সে (১৯২৪) ইংলন্ড, ফ্রান্স ও জার্মানি ডয়েস পরিকল্পনা অনুমোদন করে।

সাময়িকভাবে ক্ষতিপূরণ সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান হবার ফলে শুধু জার্মানি ও মিত্রপক্ষের সম্পর্কের উন্নতি হল না, ইংলন্ড ও ফ্রান্সে সম্পর্কেরও উন্নতি হল। দ্বিতীয়ত,. সাময়িকভাবে জার্মান অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ঘটল, জার্মান ব্যবসা-বাণিজ্য ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল, নিয়মিতভাবে ক্ষতিপূরণের কিস্তি জমা পড়তে লাগল। সর্বসাধারণের মনে জার্মানির সদর্থক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা ফিরে এল। রূঢ় থেকে ফরাসি ও বেলজিয়ান বাহিনী অপসারিত হল। কিন্তু ডয়েস পরিকল্পনা ক্ষতিপূরণ দেবার সময়সীমা নির্ধারিত না করায় জার্মানি অর্থ সঞ্চয় করে রাখার কোনো অনুপ্রেরণা পায়নি। ফলে জার্মানির উদ্বৃত্ত অর্থ বিদেশি ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা হয়েছিল এবং সামগ্রিকভাবে জার্মান অর্থব্যবস্থা বিদেশি নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। জার্মানি ঋণভারে জর্জরিত

* ডিবেঞ্চার-একটি বণিক সংস্থা বা সরকারের দেওয়া ঋণপত্র।

হয়ে পড়ে। পরবর্তী পাঁচ বছর জার্মানির প্রতিটি পৌরসভা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কাছ থেকে বিরাট অঙ্কের দেনা করে। বিপুল পরিমাণ বিদেশি পুঁজি পরোক্ষভাবে জার্মানিতে উৎপাদনের জোয়ার এনে দিয়েছিল।

লোকার্নো চুক্তির পর থেকে ফ্রান্স-জার্মান সম্পর্কের উন্নতি ঘটায় জার্মানি রাইনল্যান্ডকে বিদেশি সৈন্যমুক্ত এবং সার উপত্যকাকেও ফরাসি প্রভাবমুক্ত করার দাবি জানায়। দ্বিতীয়ত, জার্মানি ডয়েস পরিকল্পনা নির্ধারিত কঠোর আর্থিক নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। তৃতীয়ত, উভয়পক্ষই চাইল ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করতে। চতুর্থত, ইংলন্ড ও ফ্রান্সের জনমতও রাইনল্যান্ডকে বিদেশি সৈন্যমুক্ত করার দাবি জানায়।

আলোচ্য সমস্যা সমাধান করার জন্য ১৯২৯ সালের ৭ জুন ইয়ং পরিকল্পনা পেশ করা হয়। জেনেভা চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রগুলি থেকে দুজন করে বিশেষজ্ঞ নিয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে দুজন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। প্রবীন মার্কিন বিশেষজ্ঞ আওয়েন ইয়ং (Owen Young) সভাপতি নির্বাচিত হলেন এবং তাঁর নাম অনুযায়ী এই কমিটি ইয়ং কমিটি নামে অভিহিত হল।

ক্ষতিপূরণ সমস্যার স্থায়ী সমাধান করার জন্য ইয়ং কমিটি সুপারিশ করে, (১) গড়পড়তা ১০০,০০০,০০০ পাউন্ড অর্থ সাঁইত্রিশটি বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। এছাড়া ছোট অঙ্কের বাইশটি বাৎসরিক কিস্তি শোধ করতে হবে। এই বাইশটি কিস্তির অর্থের পরিমাণ যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেয় আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণের সমান হয়। এই ব্যবস্থা চালু থাকবে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত। (২) জার্মান অর্থব্যবস্থাকে বিদেশি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হল। অর্থ হস্তান্তরের দায়িত্ব উত্তমর্ণ দেশগুলির পরিবর্তে জার্মান সরকারে হাতে ন্যস্ত করা হয়। (৩) প্রতিটি বাৎসরিক কিস্তির প্রায় এক তৃতীয়াংশ অর্থ (৩৩,০০০,০০০ পাউন্ড) নিঃশর্ত দেয় বলে বিবেচিত হবে। বাকি অংশ শোধ করতে গিয়ে বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, জার্মানি দুই বছরের জন্য তা স্থগিত রাখতে পারবে। শেষত, একটি আন্তর্জাতিক সেটেলমেন্ট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। এই ব্যাঙ্কের কাজ হবে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত অর্থ আদায় ও বিতরণ, বাৎসরিক কিস্তিলব্ধ অর্থের ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক ঋণপত্র ছাড়া ও সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব পালন করা।

কতকগুলি অপ্রত্যাশিত অসুবিধা অতিক্রম না করে ইয়ং পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। শ্রমিক সরকারের অর্থমন্ত্রী (Philip Snowden) ফরাসিদের কোনোরকম সুযোগ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর দাবি অনুসারে ইয়ং পরিকল্পনার একটি সংশোধিত খসড়া অনুমোদিত হয়। ১৯২৯ সালে হেগ শহরে আহুত একটি সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ১৯৩০ সালের ৩০ জুনের মধ্যে রাইন অঞ্চল থেকে সমস্ত মিত্রপক্ষীয় সৈন্য অপসারণ করা হবে। আশা করা হয় তার আগেই ইয়ং পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হবে।

৩.২.৩ ব্যর্থতার পর্ব ঃ ১৯৩০-৩৩

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল ইয়ং পরিকল্পনা ক্ষতিপূরণ পরিকল্পনার স্থায়ী সমাধান করতে পারবে। কিন্তু ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্তরে জার্মানি তথা গোটা বিশ্বে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে যাতে ক্ষতিপূরণ সমস্যার স্থায়ী সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়ে।

১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে স্ট্রেসেসম্যানের মৃত্যুর পর জার্মান রাজনীতি এক গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়। জার্মান রাজনীতিতে মধ্যপন্থী দলগুলির জনপ্রিয়তা ক্রমশ হ্রাস পায় এবং তাদের আসন সংখ্যা কমতে থাকে। অন্যদিকে বামপন্থী দক্ষিণপন্থী দলগুলির আসন সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। ১৯২৪ সালে নাৎসি

দলের ১৪টি আসন ছিল, ১৯৩০ সালে তা ১০৭-এ গিয়ে পৌঁছায়। অন্যদিকে ১৯২৪ সালে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির ৪৫টি আসন ছিল, ১৯৩০ সালে তাদের আসন সংখ্যা বেড়ে হয় ৭৭টি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহামন্দার পরিপ্রেক্ষিতে জার্মান অর্থব্যবস্থা ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। ডয়েস পরিকল্পনার যুগে মার্কিন অর্থ এক চক্রাকার আবর্তনে আবর্তিত হচ্ছিল—আমেরিকা থেকে ঋণ হিসেবে জার্মানিতে, জার্মানি থেকে ক্ষতিপূরণের দাবিদারদের কাছে, সেখান থেকে পুনরায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় ঋণ হিসেবে এই অর্থ আমেরিকায় ফিরে গিয়েছিল। ১৯২৭-২৮ সালে জার্মানি ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয় অর্থের প্রায় পাঁচগুণ বেশি বিদেশ থেকে ধার করেছিল। রাজস্ব বাড়লেও ব্যয় আরও বেশি বেড়েছিল, সব মিলিয়ে বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ বেড়েই চলেছিল। মহামন্দার ফলে মার্কিন ঋণ পাওয়া এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। নবনিযুক্ত চ্যান্সেলার ব্রুনিং কঠোরভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইলে তাঁর পতন ঘটে। এর অনেক আগেই ইয়ং কমিটির জার্মান অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ রেইখ্‌শ্‌ ব্যাঙ্কের গভর্নর হালমার শ্যাকটে (Schacht) সতর্ক করে দিয়েছিলেন, প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ জার্মানির সাধ্যের অতীত।

এই অবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুভার (১৯৩১) এক ঘোষণার দ্বারা এক বছরের জন্য বিশ্বের সমস্ত আর্থিক লেনদেন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এর ফলে জার্মানি ক্ষতিপূরণ দেওয়া থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি পেল।

১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে জার্মান সরকার ঘোষণা করল যে ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণের বাৎসরিক কিস্তি দিতে গেলে জার্মানির অর্থনৈতিক জীবন ভেঙে পড়বে। ব্যাঙ্ক অফ ইনটারন্যাশানাল সেটেলমেন্ট এ ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করে। এই পরামর্শদাতা কমিটি (Basle) বাসলে ৭ ডিসেম্বর মিলিত হয়ে জানায় ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে দেয় বাৎসরিক কিস্তি দেওয়া জার্মান সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন সরকারে পারস্পরিক ঋণ সম্পর্কে আপোষ রফা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে (Lausanne) লোসানে এই সম্মেলন আহুত হবার কথা ছিল। কিন্তু ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে তখনও পর্যন্ত ফ্রান্সে ও ইংলন্ডের তীব্র মতপার্থক্য থাকার ফলে, ১৯৩২ সালের জুন মাসে অবশেষে এই সম্মেলন আহুত হয়। এই সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় জার্মানি ১৫০ মিলিয়ন পাউন্ড এক কালীন দিলে ক্ষতিপূরণ প্রশ্নের অবসান ঘটবে। কিন্তু এই সময়েই ২ জুলাই অপর একটি চুক্তিতে বলা হয় মিত্রপক্ষের সঙ্গে তাদের উত্তমর্ণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণশোধের প্রশ্নটির চূড়ান্ত মীমাংসা হলে, তবেই ক্ষতিপূরণ প্রশ্নের নিষ্পত্তি ঘটবে। এইভাবে ক্ষতিপূরণ প্রশ্নটি শেষ পর্যন্ত আন্তঃমিত্রশক্তি ঋণের সঙ্গে জটিল গ্রন্থিতে জড়িয়ে যায়। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্ষতিপূরণ সমস্যাটি পুনরায় উন্মোচিত হবার সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে। কারণ, ১৯৩৩ সালে নাৎসিরা সব রকমের বিদেশি ঋণশোধ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। এছাড়া, জার্মানির অভ্যন্তরীণ আর্থিক সংকট জার্মানিতে বিনিয়োজিত বিদেশি পুঁজিকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়েছিল।

৩.২.৪ ক্ষতিপূরণের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

ক্ষতিপূরণ সমস্যা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং অভ্যন্তরীণ ইতিহাসে গভীর প্রভাব রেখে গিয়েছিল।

কার্যত, জার্মানি ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঠিক কতটা অর্থ দিয়েছিল তা সূক্ষ্ম গাণিতিক গবেষণার বিষয়। অধ্যাপক এ. জে. পি. টেলর দেখিয়েছেন, সে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঠিক কতটা অর্থ দিয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বণিকদের কাছ থেকে ধার করেছিল । হিসেব করলে দেখা যায় যুদ্ধের অব্যবহিত পরে সে বিভিন্ন বস্তুর (in kind) মাধ্যমে যে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল, তাছাড়া আর কোনো ক্ষতিপূরণই তাকে

দিতে হয়নি। তার উত্তমর্ণরা তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ পেয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি অর্থ তারা জার্মানিতে বিনিয়োগ করে হারিয়েছিল। অধ্যাপক ডেভিড টমসন এই সমস্যাকে 'এক অন্তঃসারশূন্য বিরাট বুদ্বুদে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। জার্মানি দেখিয়ে দিয়েছিল একটি অধমর্ণ রাষ্ট্র কীভাবে উত্তমর্ণ রাষ্ট্রগুলিকে বাধ্য করে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে। উত্তমর্ণ রাষ্ট্রগুলির আশা ছিল, তারা শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পদ ফেরৎ পাবে। কিন্তু তারা ঠকেছিল। ১৯২৪ থেকে ৩১ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অধমর্ণ রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে শোধ পেয়েছিল দুই বিলিয়ন ডলার, অথচ সে জার্মানিকে ধার দিয়েছিল ২.৫ বিলিয়ন ডলার। কার্যত, ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য যে অর্থ জার্মানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে পেয়েছিল তার একটি অংশ জার্মানি তার আর্থিক পুনর্গঠনের কাজে লাগিয়েছিল।

অন্যদিকে, ক্ষতিপূরণ সমস্যা অপ্রত্যাশিতভাবে মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। প্রচুর জার্মান জাহাজ ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাওয়ায় ইংলন্ডের জাহাজ শিল্পে মন্দার সৃষ্টি হয়েছিল।

সামগ্রিকভাবে ক্ষতিপূরণ সমস্যা ও যুদ্ধকালীন ঋণশোধ সমস্যা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিশ্ব বাণিজ্যকে নঞর্থকভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রথমত, ক্ষতিপূরণ সমস্যাকে সরাসরি মিত্রপক্ষীয় ঋণের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারলে আন্তর্জাতিক ঋণশোধের সমস্যার একটি সহজ সমাধান করা সম্ভব হত। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সরাসরি ক্ষতিপূরণলব্ধ অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপত্তি জানায়। দ্বিতীয়ত, যে সময়, অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল, এবং সম্পদ ও পরিষেবার দ্বিপাক্ষিক চলাচল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রগতির জন্যই অপরিহার্য ছিল,সেই সময় পুঁজি বা অর্থের একপাক্ষিক চলাচল বাণিজ্যিক অচলাবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

ক্ষতিপূরণ ও যুদ্ধকালীন ঋণ সমস্যা রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে পৌনঃপুনিক তিক্ততা ও প্রতিহিংসা পরায়ণতা সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য যখন বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা দরকার, তখন এই তিক্ততা এক অমঙ্গলের আবহাওয়া গড়ে তুলেছিল।

আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিশেষ করে, "জার্মানিকে অর্থ দিতে বাধ্য করার" একগুঁয়ে জেদ ফ্রান্স ও জার্মানির সম্পর্ককে চিরতরে তিক্ত করে তুলেছিল। এ. জে. পি. টেলরের ভাষায় 'ক্ষতিপূরণ ছিল একটি প্রতীক। এটি সৃষ্টি করেছিল ক্ষোভ, সন্দেহ এবং আন্তর্জাতিক শত্রুতা। অন্য সব কিছুর তুলনায় এটিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ উন্মুক্ত করেছিল।' ("Reparation counted as symbol. They created resentment, suspicion, and international hostility. More than anything else, they cleared the way for the Second World War") *Origins of the Second World War.* টেলরের এই বক্তব্য পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। এটিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ বলা যায় না।

বিশেষত, ফরাসি-জার্মান সম্পর্ক তিক্ততর হয়ে উঠেছিল। প্রথমত, রাইনল্যান্ডের দক্ষিণে ফরাসি বাহিনীর আচরণ ছিল বিজয়ীর মতো। দ্বিতীয়ত, রাইনল্যান্ডে ফরাসি বাহিনীতে একটি অশ্বেতকায় সৈন্যদলের উপস্থিতি তীব্র জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। ফরাসি ঐতিহ্যে শ্বেতকায় ও অশ্বেতাকায় মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না । কিন্তু জার্মানরা এতে অপমানিত বোধ করে। কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিকদের তথাকথিত অন্যায় আচরণ জার্মান প্রচারযন্ত্র কাজে লাগিয়েছিল। তৃতীয়ত, রাইনল্যান্ডে ফরাসি সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছিল। তবে শেষ বর্যন্ত এই আন্দোলন সফল হয়নি। চতুর্থত, ফ্রান্স রূঢ় অধিকার করায় জার্মানরা নিষ্ক্রিয়

প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে। ফ্রান্স পাল্টা প্রতিরোধ শুরু করে। পঞ্চমত, ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে ফ্রান্সের অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি জার্মান-ফ্রান্স সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

তবে ১৯২৪ সালের পর স্ট্রেসেসম্যানের নেতৃত্বে ফ্রান্স-জার্মানি সহযোগিতার পর্ব শুরু হয়। একদিকে দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা প্রচেষ্টা এবং রাইনল্যান্ড অঞ্চলকে বিদেশি শত্রুমুক্ত করার চেষ্টা হয়। এর পাশাপাশি জার্মানি ক্ষতিপূরণের প্রথম কিস্তি দিতে আরম্ভ করে।

জার্মানির ওপর অবাস্তব দাবি চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে কেইনস তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁর বক্তব্য দুর্ভাগ্যক্রমে হিটলারীয় প্রচারের প্রধান উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তিনি অন্তত একটি সঠিক অনুমান করেছিলেন যে এই ক্ষতিপূরণ কয়েক বছরের বেশি আদায় করা যাবে না।

ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ স্বর্ণ সম্ভার আমেরিকার সিন্দুকে গিয়ে জমা হয়। আমেরিকা অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতির ভয়ে এই সোনা সিন্দুক থেকে বের করেনি। অথচ, পৃথিবীর অন্যান্য সব জায়গায় সোনার অভাবে স্বর্ণমান ছেড়ে দিতে হয়েছিল— এ ব্যাপারে নেতৃত্বে ছিল গ্রেট ব্রিটেন। ১৯২০-র দশকের গোড়ায় ক্ষতিপূরণকে কেন্দ্র করে যে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল এবং ১৯২৯ সালের গোড়ায় যে বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রভাবে গোটা পৃথিবীর অর্থনীতি সঙ্কটাপন্ন হয়েছিল—দুটি ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে অমোঘ যুক্তিকাঠামোয় যুক্ত।

৩.৩.১ মহামন্দা (১৯২৯)

১৯৩১ সালে জে. এম. কেইনস (Keynes) বলেছিলেন, "আমরা আজ আধুনিক পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনৈতিক সংকটের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি—এই বৃহত্তম সংকট প্রায় পুরোপুরি অর্থনৈতিক কারণ থেকে জাত"। ("We are today in the middle of the greatest economic catastrophe-the greatest catastrophe due almost entirely to economic causes of the Modern World") উৎস : P. Fearson, *"The Origins and Nature of the Great Slump"*. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরম্ভ করে এই মহামন্দা পৃথিবীর সকল শিল্পায়িত অগ্রসর রাষ্ট্র থেকে অনুন্নত প্রাথমিক উৎপাদক (primary producer) রাষ্ট্র পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

কেন এবং কীভাবে এই মহামন্দার সৃষ্টি হল। এই জটিল ঘটনাক্রমের যে কোনো ব্যাখ্যা অনুমান মাত্র, কারণ এখনও পর্যন্ত অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা এই সঙ্কটের বিস্তারিত তথ্য সম্পর্কে একমত হতে পারেননি। তবু মহামন্দা সম্পর্কিত সর্বজনগ্রাহ্য যুক্তিগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করা যায়।

মহামন্দা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ায় প্রমাণ হয়, বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল এবং কতকগুলি সূত্র দ্বারা গ্রথিত। উনিশ শতকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচামালের উৎস, উৎপাদিত পণ্যের বাজার এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু হয়। এই অনুসন্ধানের সূত্র ধরেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত এই ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটায়। তবে ১৯২০-র দশক থেকেই এই আদান-প্রদান আবার চালু হয় আর এই বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের সূত্রেই সমৃদ্ধির পাশাপাশি সঙ্কটের ঢেউও পৌঁছে যায় দূরে দূরান্তে। উনিশ শতক থেকেই অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সাত থেকে দশ বছর পর পর তেজি ও মন্দা বাণিজ্যের চক্রাকার আবর্তনে আবর্তিত হত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ইতিহাস থেকে প্রমাণ করা যায়, ১৯১৩ সাল নাগাদ ইয়োরোপের কয়েকটি প্রধান রাষ্ট্র সমৃদ্ধির চূড়ান্ত শীর্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল. কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ এই সমৃদ্ধিকে ১৯১৯-২০ পর্যন্ত থমকে রাখে, ১৯২১-২২ সাল থেকেই মন্দার প্রবণতা এসে যায়। এই প্রবণতা অনুসারে ১৯২০ দশকের শেষাশেষি বাণিজ্যিক মন্দা ছিল প্রত্যাশিত।

যখন এই মন্দা এসে পৌঁছল, তখন দেখা গেল এটি সাধারণ নিয়মমাফিক চক্রাকার মন্দা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ একটি ঘটনা। বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশে ভারসাম্যের অভাব এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল, যেখানে প্রতিটি সাফল্যের আড়ালে লুকিয়ে ছিল প্রগাঢ় সঙ্কট। অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রেই এই আপাত বিরোধিতার উপস্থিতি প্রকট হয়ে উঠেছিল।

যুদ্ধোত্তর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল সবচেয়ে বড় উৎপাদক, ঋণদাতা এবং পুঁজি বিনিয়োগকারী। মার্কিন অর্থনীতির অগ্রগতি গোটা শিল্পায়িত বিশ্বের অর্থনৈতিক বিকাশকে কম বেশি প্রভাবিত করেছিল। '২০-র দশকের দ্বিতীয়ার্ধে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকার ৩% মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অথচ পৃথিবীর শিল্পজাত পণ্যের ৪৬%, মোট তেলের ৭০%, মোট কয়লার ৪০%, উৎপন্ন হ'ত আমেরিকায়। তাছাড়া, আমেরিকার উদ্বৃত্ত পুঁজির প্রবাহ জার্মান ক্ষতিপূরণ এবং আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণশোধ সমস্যার সমাধান করতে সাময়িকভাবে সাহায্য করেছিল। সে বিশ্বের অর্থবাজারে অর্থের উপযুক্ত গতিশীলতা (liquidity) বজায় রেখে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল।

ইয়োরোপে কয়লা, ইস্পাত ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ওপর অত্যাধিক ঝোঁক পড়ার ফলে ভোগ্যপণ্য কেন্দ্রিক নতুন শিল্পগুলি অবহেলিত হয়ে পড়েছিল। কাজেই ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানির মতো ইয়োরোপীয় দেশগুলি বিশ্ববাণিজ্যে তাদের পূর্বতন অবস্থান থেকে ক্রমশ নেমে যেতে লাগল। এর বিপরীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোটর গাড়ি শিল্পের মতো ভোগ্যপণ্য শিল্পকে প্রাধান্য দিয়ে ইয়োরোপের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছিল। কৃষিক্ষেত্রেও একই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। ইয়োরোপ এবং উত্তর আমেরিকা অধিকতর দক্ষতা এবং ব্যাপকতর প্রযুক্তির প্রয়োগে উৎপাদন বৃদ্ধি করে কৃষিপণ্যের মূল্যাহার কমিয়ে ফেলে. কৃষিপণ্যের দাম কমে যাওয়ায় অশুভ ছায়া পড়েছিল কাঁচামাল উৎপাদনকারী রাষ্ট্রগুলির ওপর। অর্থনীতির দুটি ক্ষেত্রেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রগতি কার্যত, অন্যান্য রাষ্ট্রে অগ্রগতির গতিরোধ করেছিল। শিল্প উৎপাদনের গৌণ ক্ষেত্রে (Secondary) সে বিশ্বের বাজারকে রপ্তানি বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিল, অথচ ইয়োরোপীয় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সে শুল্ক প্রাচীর অবলুপ্ত করতে প্রস্তুত ছিল না। আবার, উৎপাদনের প্রাথমিক (primary) ক্ষেত্রে, অর্থাৎ কৃষি ও কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে চাহিদা সীমায়িত হওয়ায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উৎপাদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সহজেই পৌঁছে গিয়েছিল।

পুঁজি সরবরাহ করে বিদেশে বাণিজ্যকে চাঙ্গা করার ক্ষমতা পরোক্ষভাবে বাণিজ্যিক মন্দার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করেছিল। ১৯২০-র দশকে পুঁজির কোনো অভাব ছিল না। ১৯২৫ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৯০০,০০০,০০০০ ডলার ইয়োরোপীয় দেশগুলিকে ঋণ দিয়েছিল। এর ফলে আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রাধান্য প্রমাণিত হয়েছিল। মার্কিন ডলারের সাহায্যেই জার্মানির পক্ষে ক্ষতিপূরণের কিস্তি মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থে পুনর্গঠনের কাজ করা সম্ভব হয়েছিল। আবার, অন্যদিক থেকে মার্কিন বিনিয়োগের কতকগুলি নেতিবাচক দিক ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অধমর্ণ হবার বৃত্ত হড়ে তুলেছিল। প্রথমত, মার্কিন ঋণের সাহায্যে জার্মানি মিত্রপক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল, তারা আবার সেই অর্থের সাহায্যে আমেরিকার যুদ্ধকালীন বিনিয়োগের ওপর সুদ দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর দরিদ্রতর দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ শোধ করার জন্য তার কাছ থেকেই পুনরায় অর্থ ধার করে। পণ্য উৎপাদনে মার্কিন স্বনির্ভরতার ফলে পণ্যের মাধ্যমে ঋণ শোধ করার কোনো উপায় ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে, বিনিয়োগ বাড়ালেও ব্যবসার পরিমাণ বাড়নি, কেননা ঋণশোধ করা হল সোনা দিয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোনার কোনও কার্যকারিতা ছিল না। সেখানে আরও বেশি সোনা যাওয়া মানে, খনিতে ফিরে যাওয়ার মতোই অবস্থা। সোনা অমিল, জিনিসের দাম পড়ে যায়, আমেরিকায় মহামন্দা আসার আগেই

গোটা পৃথিবীতে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় অধমর্ণদের ঋণশোধ করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। ১৯২৯ সাল নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সমস্ত সরবরাহকৃত সোনার ভাণ্ডারে পরিণত হয়। তার ফলে পণ্য বিনিময়ের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বিকৃত হয়ে পড়ে।

পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই বিকৃতি জন্ম দেয় তৃতীয় স্ববিরোধের। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ইংলন্ড বহু চেষ্টায় ১৯২৫ সালে পাউন্ডকে স্বর্ণমানে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল। ১৯২৮ সালে ইংলন্ড অন্যান্য দেশগুলিকে তার উদাহরণ অনুসরণ করতে উৎসাহিত করে। তাতে বাণিজ্যিক অস্থিরতা দূর হবার বদলে আরও বেড়ে যায়। বিভিন্ন দেশের সরকার নিজেদের মুদ্রার মূল্যহার বাড়াতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণ রফতানির পথ প্রশস্ত করে। ১৯২৭ সালের জেনেভা সম্মেলন এই অর্থনৈতিক সঙ্কট দূর করার জন্য মিলিত হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। বিভিন্ন দেশ সংরক্ষণমূলক বাণিজ্যনীতির আড়ালে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

১৯২৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহামন্দা নেমে আসে। গত এক দশক জুড়ে অপর্যাপ্ত পুঁজি সরবরাহের সাহায্যে মার্কিন শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সচেতনভাবে পুঁজি সরবরাহের নীতি গ্রহণ করেছিল। ১৯২৮ সালে শেয়ার বাজারে মূল্যহার ২৫% বেড়ে গিয়েছিল, ১৯২৯ সালে তা ৩৫%, বৃদ্ধি পায়। ১৯২৫ সালের পর থেকেই ফাটকাবাজি বেড়ে গিয়েছিল। ১৯২৮ সালে ফেডেরাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়িয়ে পুঁজির বাজারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। সাগর পারে বিনিয়োজিত পুঁজি আমেরিকায় ফিরিয়ে আনার ফলে অভ্যন্তরীণ পুঁজি ফুলে ফেঁপে ওঠে। যতদিন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের তেজিভাব বজায় ছিল, ততদিন সঙ্কট প্রকট হয়ে ওঠেনি। ভোগ্যপণ্যের চাহিদার তুলনায় যোগান এত বেড়ে গিয়েছিল যে উৎপাদন হ্রাস অপরিহার্য হয়ে ওঠে। অনন্ত অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ধারণা মরীচিকায় পরিণত হয়।

বাণিজ্যিক চক্রে ধীর আবর্তনের কারণ উৎপাদক মণ্ডলীর অসংগঠিত আশাবাদ। দশটি কাপড়ের চাহিদা থাকলে ১০০টি কাপড় উৎপাদন করা হল— অর্থাৎ ৯০টি কাপড় ক্ষতি স্বীকার করে কম দামে বাজারে ছেড়ে দিতে হল। ১৯২৯ সালে আমেরিকা ৫,৩৫৮,০০০ মোটরগাড়ি, ৫৫০০০০০০০ টন ইস্পাত এবং মোট জনসংখ্যার তিনগুণ বুট জুতো উৎপাদন করেছিল। জুতো কারখানার আরও তিনগুণ উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল। এর পাশাপাশি আমেরিকার প্রাকৃতিক সম্পদ বিপুল, বেতনহার অত্যন্ত চড়া। কাজেই সে বাইরের পৃথিবীতে উৎপাদিত পণ্য চড়া শুল্কের প্রাচীর দিয়ে আটকে রাখতে চেয়েছিল।

আলোচ্য পরিস্থিতিতে আমেরিকা নিজের পণ্য রপ্তানি করতে চাইলে তাকেই সেই পণ্য কেনার অর্থও ধার দিতে হ'ত। সেই সময় যুদ্ধ ঋণ একটি বিতর্কিত বিষয়, রাশিয়ার মতো বৃহৎ রাষ্ট্রের বিপুল ঋণ মুকুব করে দেওয়া হয়েছিল, কাজেই লগ্নিকারীরা দীর্ঘস্থায়ী ঋণ দিতে অস্বীকার করেছিল। অধিকাংশ ঋণই ছিল স্বল্পমেয়াদী ঋণ, যা যে কোনো মুহূর্তে ফেরৎ নেওয়া যাবে। ফলত, পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র অত্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অস্থিরতা জন্ম নেয়। পূর্বতন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি— যেমন সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড প্রত্যেকেই স্বল্পমেয়াদী ঋণের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। এই রাষ্ট্রগুলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজির পাহাড়ে জমে গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই অলস পুঁজি তারা বিভিন্ন দেশকে ধার দিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা বা বিনিময় মাধ্যমের অবমূল্যায়নের গুজব ছড়ালেই এই পুঁজি ফেরৎ চাওয়া হ'ত। লোকার্নো পর্বের অর্থনৈতিক আশাবাদের ভিত্তি ছিল নিয়ত পরিবর্তমান। যে কোনো মুহূর্তে বিপর্যয়ের ভীতি ধ্বংস করে ফেলত আপাত সমৃদ্ধিকে।

কাজেই শেষ পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে বা শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনের আধিক্য নয়, ফাটকা বাজির বুদ্বুদ ফেটে যাওয়াতেই ঘটেছিল বিপর্যয়—এই ঘটনাকে তুষার ঝটিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়। ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে ওয়ালস্ট্রীটে শেয়ার বাজারে ভাঙনের পদচিহ্ন শোনা যায়। ২৪ অক্টোবর কৃষ্ণ বৃহস্পতিবার শোয়ারের মালিকরা উন্মাদের মতো শেয়ার বিক্রি করতে আরম্ভ করে। ঐ একদিনে প্রায় ১৩ মিলিয়ন শেয়ার বিক্রি হয়। ২৯ তারিখে আরও ১৬.৫ মিলিয়ন শেয়ার হস্তান্তরিত হয়। ঐ মাসের শেষে আমেরিকার লগ্নিকারীদের ৪০,০০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়। সরকার এবং ব্যাঙ্কগুলি শত চেষ্টাতেও এই ধ্বংস আটকাতে পারল না। নভেম্বর মাসে আরও একটি সর্বনাশা ধস্ মার্কিন অর্থ ব্যবস্থাকে স্তব্ধ করে দিল। পুঁজি আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে গেল।

মন্দার প্রভাবে শিল্পগত উৎপাদন ও জাতীয় আয় অর্থক হয়ে গিয়েছিল। জাতীয় উৎপাদনের হার এক তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছিল, কর্মক্ষম নাগরিকদের ২৫%, কর্মহীন হয়ে পড়লেন। এক তৃতীয়াংশ ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পাইকারি মূল্যহার ৩২%, হ্রাস পেয়েছিল। সামগ্রিকভাবে কৃষিপণ্যের মূল্যহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। ১৯৩০ সালে প্রায় ১৩৪৫টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে যায়। ১৯২৯ থেকে ৩০ সালের মধ্যে মার্কিন পুঁজিপতিরা বিদেশে ঋণ দেওয়া ৬৮%, হ্রাস করে তারপর বন্ধ করে দেয়। তার ফলে আমদানি প্রায় ৪০% হ্রাস পায়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে রক্ষা করার জন্য কঠোরতম শুল্ক আইনের মাধ্যমে ৫৯%, শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়ে (Hawley Smoot Tarriff Act. 1930) গ্যাথর্ন হার্ডির ভাষায় "অ্যাটলাস কাঁধে করে যে পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছিল , তা পিছলে পড়ে চূর্ণ হয়ে গেল।" ("...the world slipped with a crash from the shoulders of the Atlas who had sustained it.")

৩.৩.২ মহামন্দার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

বিশ্ব অর্থনীতি অমোঘ যুক্তি কাঠামোয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সময়ের চালু ঠাট্টা ছিল 'আমেরিকার হাঁচলে সারা পৃথিবীর ঠান্ডা লেগে যায়।' ১৯২০-র দশকের অর্থনৈতিক ও আর্থিক কাঠামো ছিল ভঙ্গুর; সুতরাং আমেরিকার বিপর্যয় খুব সহজেই অন্য অর্থনীতিগুলিকে বিপর্যস্ত করেছিল।

১৯২৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইয়োরোপকে ঋণ দেওয়া বন্ধ করল। এর ফলে পৃথিবীর একটা বড় অংশের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেল। আবার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবার ফলে মূল্যহার নেমে গেল। মূল্যহার নেমে যাওয়ায় কাঁচামাল উৎপাদনকারী রাষ্ট্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হল। দক্ষিণ গোলার্ধে অস্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিম গোলার্ধে আর্জেন্টিনায় কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস পায়। কফির বাজার পড়ে যাওয়ার পরের বছর ব্রাজিল দেউলিয়া হয়ে পড়ে মধ্য ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে শিল্প বাণিজ্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

মহামন্দার প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে গভীর সঙ্কট ছাড়াও বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অভিঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুত পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে কে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। বিভিন্ন অর্থনীতির মধ্যে তুলনামূলক বিচারও সহজ নয়। ১৯৩৬-এ আমেরিকার The Brooking Institution শিল্পোৎপাদনের ভিত্তিতে জার্মানি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও পোলান্ডের অর্থনীতিকেই সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত বলে নির্দিষ্ট করেছিল। এর পরেই ছিল চেকোশ্লোভাকিয়া. হল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ার স্থান। শিল্পায়িত দেশগুলির মধ্যে জাপান সব থেকে কম প্রভাবিত হয়েছিল; ব্রিটেনের বিপর্যয়ও আপেক্ষিকভাবে কম অনুভূত হয়েছিল। অন্যদিকে, ফ্রান্সে এর প্রভাব শুরু হয় একটু দেরিতে। কিন্তু ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি অন্যত্র অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন শুরু হলেও, ফ্রান্সের অর্থনীতি ক্রমশ নিম্নমুখী হয়েছিল। ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি।

শিল্পোৎপাদনের সারণী (১৯২৯ = ১০০)

	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩২	১৯৩৫
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৮৯	৯৩	১০০	৮১	৫৪	৭৬
ইংলন্ড	৯৬	৯৪	১০০	৯২	৮৪	১০৬
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৬৪	৮০	১০০	১৩১	১৮৩	২৯৩
জার্মানি	১০২	৯৯	১০০	৮৬	৫৩	৯৪
অস্ট্রিয়া	৯০	৯৯	১০০	৮১	৬০	৭৭
ফ্রান্স	৭৯	৯১	১০০	১০০	৬৯	৬৭
পোলান্ড	৮৭	১০০	১০০	৮২	৫৪	৬৬
জাপান	৮৩	৯০	১০০	৯৫	৯৮	১৪২

উৎস : *Statistical Yearbook to League of Nations,1935-7, (Geneva, 1937)*

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তারতম্য অনুসারে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীতে ছিল স্বর্ণমান গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, পোল্যান্ড, হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ড। এই রাষ্ট্রগুলি দেশীয় অর্থব্যবস্থাকে মহামন্দার গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য শুল্ক সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্রিটেন ও তার সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বর্ণমান ত্যাগ করে পাউন্ডের মাধ্যমে লেনদেন আরম্ভ করে। এই দেশগুলিকে স্টার্লিং গোষ্ঠী বলা হয়। এখানে মুদ্রামূল্যহ্রাস পায়। পরে সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড ও এস্তোনিয়াও স্টার্লিং গোষ্ঠীতে যোগদান করে। ক্রমে স্পেন, পোর্তুগাল, গ্রীস এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশিষ্ট দেশগুলির নেতা জার্মানি। এরা স্বর্ণ রপ্তানি নিষিদ্ধ করে স্বর্ণমানে ত্যাগ করে। জার্মানি বিনিময় নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করেছিল। ১৯৩৩ সালের পর নাৎসি সরকার দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়। মধ্য ইয়োরোপের যে দেশগুলি জার্মানির কাছে ঋণী ছিল, তাদের সঙ্গে বাণিজ্য করে। এমনকি, জার্মানি পণ্য-বিনিময় পদ্ধতিও অবলম্বন করেছিল— যেমন জার্মান কয়লার বিনিময় ব্রাজিলের কফি, জার্মান সারের বিনিময়ে মিশরের তুলো। এমন কি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও মার্কিন তুলোর সঙ্গে জার্মানির পণ্য বিনিময় করতে আগ্রহী ছিল।

জার্মান অর্থব্যবস্থায় মহামন্দার প্রভাব পৃথক উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯৩২ সালের আগে পর্যন্ত জার্মানি মুদ্রা সংকোচন (deflation), মজুরিহ্রাস, সরকারী ব্যয় হ্রাস ইত্যাদি নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সঙ্কটের মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মন্দা দীর্ঘায়িত হওয়ায় এই পরিকল্পনাগুলি প্রত্যাহার করে নিতে হয়।

১৯৩৩ সালে জার্মানির কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। জার্মানি ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি জার্মানির রাজনৈতিক জীবনেও বিপর্যয় নেমে আসে। ১৯৩৩ সালে ভাইমার প্রজাতন্ত্র বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। নাৎসিরা প্রথম থেকেই ইয়ং পরিকল্পনা স্ট্রেসেসম্যানের পরিপূর্ণতার নীতির (fulfilment) বিরোধিতা করেছিল। অর্থনৈতিক সঙ্কট তাদের যুক্তির সত্যতা প্রমাণ করে। গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী সাফল্যের মাধ্যমে নাৎসি নেতা অ্যাডল্‌ফ হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। জার্মানির ইতিহাসে একনায়কতন্ত্রের জয় সূচিত হয়।

মহামন্দার প্রথম পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল অস্ট্রিয়ায়। ১৯৩১ সালের ১১ মে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অবস্থিত ক্রেডিট অ্যানস্টাট (Credit Anstalt) দেউলিয়া হয়ে যায়। অথচ এই সংস্থাটি ছিল আন্তর্জাতিক আদান প্রদানের কেন্দ্রবিন্দু। মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। জানুয়ারী মাসে অস্ট্রিয়া জার্মানির সঙ্গে শুল্ক ইউনিয়ন গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ফ্রান্সের কূটনৈতিক চাপে এই চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়।

ইংলন্ডেও এই মন্দার গভীর প্রভাব পড়েছিল। এক বিপুল পরিমাণ সোনা ইংলন্ডের রাজকোষ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এই সঙ্কটের চাপে পরবর্তী নির্বাচনে একটি রক্ষণশীল জাতীয় সরকার (National Government) কায়েম হয়। সৈন্যবাহিনীর বেতন হ্রাস করায় ইনভার গরডনে একটি নৌ-বিদ্রোহ হয়। ইংলন্ডের বাইরে এই ঘটনাকে একটি গুরুতর বিপ্লব বলে ধরে নেওয়া হয় এবং ইংলন্ডের অর্থের ওপর আন্তর্জাতিক আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। পরিস্থিতির চাপে পড়ে ইংলন্ড স্বর্ণমান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থায় নেতৃস্থানীয় দেশের মৌলিক অর্থনৈতিক দুর্বলতা উন্মোচিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সাগরপারের বাজারগুলি ওপর নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়ায় ইংলন্ডের পক্ষে পূর্ব গৌরব অর্জন করা আর সম্ভব হয়নি।

একদিকে কঠোর বাজেট নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যদিকে, ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে (বাড়ি তৈরি শিল্প, মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি) গুরুত্ব আরোপ করে বাজেটে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলেও শিল্পের প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলিতে মন্দা দীর্ঘায়িত হয় এবং কর্মহীনতা বৃদ্ধি পায়।

পরিস্থিতির চাপে, অবাধ বাণিজ্যনীতির প্রধান প্রবক্তা ইংলন্ডে ৮৬ বছরের নীতি পরিত্যক্ত হয় ইম্পোর্ট ডিউটিস অ্যাক্টের (১৯৩২) মাধ্যমে। অটওয়া কনফারেন্সে অধীনস্থ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্হিবাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়।

মহামন্দার গোড়ার দিকে ফ্রান্স সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ফ্রান্স অযৌক্তিকভাবে স্বর্ণমান ধরে রাখার চেষ্টা করায় আন্তর্জাতিক বাজারে অন্যান্য জাতীয় মুদ্রার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে অধীনস্থ উপনিবেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করলেও ফ্রান্স বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ফরাসি রাজনীতিতে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় স্থায়ী পার্টি ভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় ঋণশোধের প্রশ্নটি মহামন্দার সঙ্কটকে জটিলতর করে তোলে। রাষ্ট্রপতি হুভার এক বছরের জন্য সকল আন্তর্জাতিক ঋণশোধের ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ দেন। ইংল্যান্ড এ ব্যাপারে স্বাগত জানালেও ফ্রান্স তার ক্ষোভ জানায়। শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ অধমর্ণ রাষ্ট্রই যুদ্ধকালীন ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে তাদের অক্ষমতা জানায়। প্রথমে ফ্রান্স, তারপর ইংলন্ড এবং ১৯৩৩-এর পর সব রাষ্ট্রই ঋণশোধ বন্ধ করে দেয়।

মার্কিন সরকার অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের মোকাবিলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সেনেটের কাছ থেকে বিশেষ অধিকার অর্জন করে মার্কিন অর্থব্যবস্থাকে দৃঢ় সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। নানাদিক থেকে সুরক্ষা দিয়ে মার্কিন অর্থব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার এই প্রকল্প নিউডিল (New Deal) নামে পরিচিত।

[৩.৪.১. অনুচ্ছেদে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।]

বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট দূর করার আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাগুলি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেনি। ১৯৩১ সালের ২০ জুন ঘোষিত হুভার স্থগিতাদেশ (Hover Moratorium) ফ্রান্সের বিরোধিতায় কার্যকর হতে পারেনি। ফ্রান্সের আপত্তি মেনে নেওয়ায় ৬ জুলাই এই স্থগিতাদেশ গৃহিত হয়। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাইস ব্যাঙ্ক থেকে ১০০ মিলিয়ান মার্ক তুলে নেওয়া হয়। জার্মান অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

জার্মানির বিপর্যয় পর্যালোচনার জন্য মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিরা (২০ জুলাই) লন্ডনে মিলিত হয়। ফ্রান্স জার্মানিকে সহায্য করার বিনিময়ে এমন অবাস্তব রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আমানত দাবি করে যে সম্মেলন ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৯৩১ সালের ১৯ আগস্ট বাসলে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্কার্স্ কমিটির অনুমোদন অনুসারে জার্মানিকে ছয় মাসের জন্য বিদেশি মুদ্রায় ঋণ দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এ বছরের শেষে জার্মানি ক্ষতিপূরণ দিতে অপারগতার কথা জানায়।

১৯৩২ সালে জানুয়ারী মাসে আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণের প্রশ্নে যে সম্মেলন হবার কথা ছিল ইংলন্ড ও ফ্রান্সের মতপার্থক্যের ফলে তা পিছিয়ে যায়। ১৯৩২ সালের জুন মাসে লোসান সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগ দেয়নি। কারণ, মার্কিন সিনেট ঋণ হ্রাস করার বা স্থগিত রাখার বিরোধী ছিল। ১৯৩৩ সালের ১২ জুন লন্ডনে আহুত ওয়ার্ল্ড মানিটারি অ্যান্ড ইকনমিক কনফারেন্সে মুদ্রামানের ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ, ৩ জুলাই নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রপতি সকলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেন। গ্যাথোর্ন হার্ডির মতে 'এটি যুদ্ধোত্তর ইতিহাসের অন্যতম প্রধান আশাভঙ্গ।' ("It was a major disappointment of post war history.")

কার্যত, এই মন্দার ফলে এমন একটি বিপর্যয় ঘটে যা যুদ্ধোত্তর বিপর্যয়ের থেকেও গভীর। অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে গোটা পৃথিবীতে একটা দম আটকানো পরিবেশের সৃষ্টি হয়। প্রাচুর্য দারিদ্র্যের জন্ম দেয়, ধনবণ্টনের অসাম্যের ফলে প্রাচুর্য ও অনাহারের সহাবস্থান ঘটে। বাণিজ্যিক সঙ্কট, বাণিজ্য সঙ্কোচনের সঙ্গে যুক্ত হয় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সঙ্কট। এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলল। দুই শত বছরের প্রাচীন 'লেসে ফেয়ার' (অবাধ বাণিজ্য নীতি) নীতির অবসান ঘটে।

অর্থনৈতিক সঙ্কটের ছায়া পড়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। ১৯৩০ -এর দশকের মাঝামাঝি থেকে মন্দাজনিত হতাশা, বেকারি, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদির ফলে পশ্চিম ইয়োরোপের প্রাচীন সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে অস্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। ইংলন্ডে মোসলের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ফ্যাসিস্ত আন্দোলন, ফরাসি ফ্যাসিস্ত লীগ প্রভৃতি উগ্র দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ইতালীয় ফাদিবাদের পাশাপাশি জার্মানিতে নাৎসিবাদ শক্তিশালী হবয়ে ওঠে। সুদূরপ্রাচ্যে জাপানে সামরিক বাহিনীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই, অর্থনৈতিক সঙ্কট বিশ্বশান্তি ও যৌথ নিরাপত্তার দিক থেকেও কম ক্ষতিকারক ছিল না।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সংকটের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল মূল্যবোধের সংকট, মনস্তাত্ত্বিক সংকট। অধ্যাপক ই. এইচ. কার তাই ১৯৩১ সালকে বলেছেন, 'বিপর্যয়ের বছর'।

ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লবের পর থেকে এ্যাডাম স্মিথ প্রভৃতি ধ্রুপদী পলিটিক্যাল ইকনমির প্রবক্তারা মুনাফার অবাধ মুক্তির সঙ্গে মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গীন মুক্তিকে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। জ্ঞানদীপ্তি আন্দোলনে যুক্তির মুক্তি আর অবাধ বাণিজ্যের মুক্তি মিলিয়ে জন্ম নিয়েছিল মুক্তপন্থা (leberalism)।

কিন্তু অবাধ বিনিয়োগ ও ফাটকাবাজি ১৯২৯ সালে ধ্বসে পৌঁছে দিয়েছিল। মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক উদ্যোগ ১৯৩১ সালের বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। এই অবস্থা থেকে রক্ষা পাবার জন্য ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ আত্মরক্ষাত্মক অস্ত্রশস্ত্র যৌথ উদ্যোগে কোনো রাষ্ট্রের আর আস্থা ছিল না। তার পরিবর্তে প্রাধান্য লাভ করেছিল বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতীয় অর্থনীতি।

৩.৪.১ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ

১৯২৯ সালের মহামন্দার প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকাসহ অন্যান্য ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি কম বেশি বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি অবলম্বন করে। এই অবস্থাকেই অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ বলা হয়ে থাকে।

জার্মান ভাষায় অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের অর্থ অটার্কি (autarky)। অটার্কি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা। অটার্কি শব্দটি প্রকৃত অর্থাৎ জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সীমানার মধ্যে বাণিজ্যিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা। অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে— কখনও সংরক্ষণমূলক বাণিজ্যনীতি, কখনও বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার প্রতিযোগিতা এড়িয়ে জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়া। বহু পূর্বেই আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন, ফ্রিডরিশ লিস্ট-এর মতো জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদরা রাষ্ট্রীয় স্তরে জাতীয় স্তরে স্বয়ং সম্পূর্ণতার তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। এদের দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল অস্ত্র উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা। এই দুটি খণ্ডিত যুক্তিই শেষ পর্যন্ত হিটলারের নাৎসিবাদে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিল। কারণ, এই পর্বে এই তত্ত্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ইয়োরোপের নবজাত রাষ্ট্রগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ। অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরির উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রসমূহ চড়াশুল্ক প্রাচীর প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে তাদের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক সীমান্তগুলি ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে অযৌক্তিক। এছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা, লাতিন আমেরিকার বৃহৎ রাজ্যগুলি শিল্প সংরক্ষণনীতি অনুসরণ করেছিল। এই সংরক্ষণ কতকগুলি বিশেষ দেশ বা বিশেষ পণ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নও পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানায় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিল।

১৯৩০-এর পরবর্তী পর্যায়ে মহামন্দা ও বিনিময় ব্যবস্থার সংকটের ফলে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ এক বিকৃত আগ্রাসী রূপ নেয়। প্রথমত, দীর্ঘদিন ধরে বেকারি সমস্যায় জর্জরিত ইয়োরাপীয় রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ করে কৃত্রিম উপায়ে বেশি সংখ্যক লোককে চাকরি দিতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, জার্মানি ও অন্যান্য দেশ বিপুল পরিমাণে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণে জড়িয়ে পড়েছিল। অথচ এই ঋণের পেছনে কোনো নির্দিষ্ট আমানত ছিল না। বিশেষত ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত সমস্যা সমস্ত পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তোলে। তৃতীয়ত, ইতালি ও জার্মানিতে বেকার সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য অস্ত্রশিল্পকে সুসংগঠিত করে তোলা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই দুটি দেশ আগ্রাসী পররাষ্ট্র নীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রভাবে প্রতিটি দেশই আগ্রাসী পররাষ্ট্র নীতির আশ্রয় নেয়নি।

৩.৪.২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : নিউ ডিল

মহামন্দাজনিত সংকট থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এক বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের আশ্রয় নেন— এটি নিউ ডিল নামে পরিচিত। নিউ ডিলের লক্ষ্য সাধারণ অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন নয়— এটির তিনটি দিক— ত্রাণ, পুনর্বাসন ও সংস্কার।

মহামন্দার ফলে বিনা দোষে কর্মচ্যুত এক বিপুল জনতার উপস্থিতি রাষ্ট্রের সামনে এক তীব্র সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। বিকল্প কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতিতে অভূতপূর্ব জরুরী অবস্থায় সুসজ্জিত প্রেসিডেন্টকে অসমাপ্ত সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ত্রাণ ও সংস্কারের জন্য

যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তা অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের অনুকূল ছিল না। সময়ের অভাবে রুজভেল্ট একই সঙ্গে নানা রকমের সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন—এক সংস্কারের সাফল্য অন্য সংস্কারের ব্যর্থতা ডেকে এনেছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যাশনাল ইনড্রাস্ট্রিয়াল রিকভারি অ্যাক্ট (NIRA) যুগপৎ ত্রাণ ও সংস্কারের দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছিল। প্রেসিডেন্টের বিশল্যকরণীর যাদুস্পর্শে প্রথমদিকে আমেরিকার জনজীবনে অভূতপূর্ব বেগ সঞ্চারিত হয়েছিল। উচ্চতর মজুরি দিয়ে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু মন্দার ফলে পুঁজি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কম পরিশ্রমে বেশি মজুরি পাবার ফলে মূল্যহার এমনভাবে বেড়ে গিয়েছিল তাতে সংস্কারের মূল উদ্দেশ্যেই বিনষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে, উৎপাদকদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দর কমানোর দায়িত্ব আর রইল না। তার ফলে শ্রমিকের ক্রয় ক্ষমতার সঙ্গে কোনো সাযুজ্য না রেখেই মূল্য বৃদ্ধি পেল। তার ফলে এই আইনের মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে গেল। অবশেষে ১৯৩৫ সালের মে মাসে সুপ্রীম কোর্টের আদেশ বলে NIRA অসাংবিধানিক বলে ঘোষিত হয়।

১৯৩৬ সালের জানুয়ারি মাসে কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত আইনেরও একই পরিণতি হয়েছিল। এগ্রিকালচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাক্টের (A.A.A) লক্ষ্য ছিল কৃষি উৎপাদনের মূল্যহার বৃদ্ধি করা। প্রথমে কৃষকদের উৎপাদন হ্রাস করতে বাধ্য করা হয়। এর বিনিময়ে তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। এই ক্ষতিপূরণের দায় গিয়ে পড়ে ভোগ্যপণ্য ক্রেতার ওপর। এতে কৃষকের সাময়িক লাভ হলেও বাজারে ভোগ্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় তার অবস্থার উন্নতি ঘটেনি।

রাজস্বক্ষেত্রে রুজভেল্টের নীতি সবচেয়ে গুরুতর আপাত বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তিনি প্রথমেই ব্যয় সঙ্কোচন, নিয়োগ সঙ্কোচন এবং সুষম বাজেট রচনার চেষ্টা করেন। তাঁর ব্যাঙ্কনীতি সাময়িকভাবে সরকারের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে এনেছিল। কিন্তু ত্রাণসংক্রান্ত ব্যয়ের ভার তাঁর ব্যয় সঙ্কোচনের প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। ১৯৩৩ সালে তিনি স্বেচ্ছায় স্বর্ণমান ছেড়ে দিয়ে মুদ্রাস্ফীতি চোরাবালিতে পা বাড়ান। ১৯৩৪ সালে ডলারের মূল্য আগের তুলনায় ৫৯% হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৩৪ সালের মে মাসে রৌপ্যক্রয় সংক্রান্ত আইন পাশ হওয়ায় সমস্ত রূপা আমেরিকার সিন্দুকে জমা হয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার শেয়ার বাজারে সোনা ও রূপার ১ : ৩ অনুপাত প্রতিষ্ঠা করা।

এই আইনের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ছিল অনভিপ্রেত। চীনে রৌপ্য মুদ্রা চালু থাকায়, তার অর্থভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেল। চীনে শেষ পর্যন্ত রৌপ্যমান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। চীনের অর্থনৈতিক সংকট ইয়োরোপীয় শক্তিগুলির উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রশান্ত সাগর অঞ্চলে শক্তিসাম্য বজায় রাখার মার্কিন স্বার্থ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পথ উন্মুক্ত হয়।

প্রচলিত ধারণা অনুসারে রুজভেল্টের 'নিউ ডিল' অভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ধ্বংসের পথ রোধ করেছিল। কিন্তু ৩০-এর দশকে ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের মূল কারণ ক্রমবর্ধমান অস্ত্রসজ্জা। এর ফলে কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্য এবং শ্রমের এক বিপুল চাহিদা সৃষ্টি হয়—যা কল্যাণকামী পরিকল্পনার গণ্ডি ছাড়িয়ে অর্থনীতিকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যায়। "আধুনিক ইতিহাসের ট্র্যাজিক পরিহাসে বৃহদায়তন সংগঠিত হিংসা বা তার প্রস্তুতি, বেকারি এবং অভাবের সবচেয়ে কার্যকর সমাধান হয়ে উঠেছিল।" ("It is perhaps the most tragic irony of modern history that organized violence on a large scale or the preparation for it, has proved to be the most effective remedy for the economic problems of under consumption and unemployment") Keylor. *The Twentieth Century World.*

৩.৪.৩ জার্মানির অটার্কি

জার্মানিতে ১৯৩৩ সালে নাৎসি পার্টি ক্ষমতায় আরোহণ করে। বেকারি ও অর্থনৈতিক সংকট কাটানোর জন্য নাৎসি সরকার সচেতনভাবে ভারী শিল্প ও সরকারী জনকল্যাণমূলক কাজে (Public works) অর্থ বিনিয়োগ করে। প্রাথমিকভাবে শতকরা ৪৪% বেকারত্ব ১৯৩৮ সালে কম ১% ভাগে এসে দাঁড়ায়। হিটলারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল দুটি ঃ জনগণকে পালন করা এবং একইসঙ্গে জার্মানিকে একটি শক্তিশালী সামরিক ও শিল্পভিত্তিক রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলা।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যবর্তী সময়কে আংশিক ফ্যাসিবাদের যুগ বলা হয়। একই সঙ্গে জার্মান রাষ্ট্র চাকরি সৃষ্টি করে, বেকারত্ব দূর করে, মজুরি হার নিয়ন্ত্রণ করে এবং ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষমতা হ্রাস করে। এই সময় জার্মান, অর্থনীতির পরিচালক ছিলেন (Schacht) শ্যাকটে। তিনি বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু ১৯৩৬ সাল নাগাদ হিটলার সাবধানী নীতিতে অধৈর্য হয়ে পড়লেন। তিনি সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে অর্থনৈতিক অস্ত্রসজ্জার গুরুত্ব তুলে ধরেন। গোয়েরিং-এর পরিচালনায় চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকর হয়। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল বাণিজ্যিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা অটার্কি (Autarky) প্রতিষ্ঠা। অধ্যাপক সওয়ার (W. Sauer) মনে করেন এই পরিকল্পনার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। অন্যদিকে অধ্যাপক ক্লেইনের (B.H. Klein) মতে হিটলার যতদিন সম্ভব সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। অর্থনীতিকে ধ্বংস করে ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের বিরূপ করতে তিনি চাননি।

কিন্তু চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনা যে ১৯৪০ সাল নাগাদ জার্মানিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে চেয়েছিল, তা অনস্বীকার্য। আলোচ্য পর্বে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সামরিক প্রস্তুতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কঠোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ফলে পুঁজি, শ্রম এবং সম্পদকে পুরোপুরি সামরিক প্রয়োজনে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। এই সামরিক প্রস্তুতিই কার্যত ১৯৩৬ সালের পর থেকে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটাতে পেরেছিল। প্রধানত দুটি উপায়ে জার্মানি এই অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে পেরেছিল। প্রথমত, জার্মানির রাসায়নিক শিল্প, কৃত্রিম রবার, কার্পাস ও পশম উৎপাদন করতে সক্ষম হওয়ায়, এই কাঁচামালগুলির জন্য জার্মানির পরনির্ভরতা দূর হল। দ্বিতীয়ত, জার্মানি দুর্বল পূর্ব ইয়োরোপীয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির উপর তার নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করল ; কারণ এই দেশগুলি ছিল কৃষিজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। পোলান্ড, হাঙ্গেরি, রুমানিয় প্রভৃতি দক্ষিণপূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করার ফলে প্রভূত পরিমাণে গম, কাঠ, তেল এবং অন্যান্য কাঁচামাল জার্মানির হস্তগত হল। এছাড়া, এই দেশগুলিতে জার্মানি তার উদ্বৃত্ত পণ্যজাত দ্রব্য বিক্রি করতেও সক্ষম হল।

সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই হিটলার ১৯৩৮-৩৯ সালে আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে পেরেছিলেন। এছাড়া, মহামন্দার ফলে পূর্ব ইউরোপে ফরাসি প্রভাব হ্রাস হওয়ায় বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও হাঙ্গেরির নবপ্রতিষ্ঠিত সরকারগুলির সঙ্গে নাৎসি জার্মানির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের পথ উন্মুক্ত হয়। মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপে বৃহত্তর জার্মানি গঠন ও নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গা (Lebensraum) পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং নির্ভরযোগ্য মিত্র হিটলারের হাতে এল। হিটলারের চূড়ান্ত পদক্ষেপ (Anschluss, 1938) অস্ট্রিয়া অধিগ্রহণ এবং পোল্যান্ড আক্রমণ (১৯৩৯) পৃথিবীকে ঠেলে দিল আরও একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে।

প্রসঙ্গক্রমে ফ্যাসিবাদী ইতালিতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রভাব উল্লেখ করা যায়। গম উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হবার জন্য মুসোলিনি গমের যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ছোট চাষীদের উৎখাত করে ধনতান্ত্রিকরাই কৃষিক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করে। শিল্পক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর হবার জন্য ইতালি ক্রমশ আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে।

৩.৫ সারাংশ

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্বে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি একটি মৌলিক স্ববিরোধের সম্মুখীন হয়। তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল, অথচ তারা নিজের স্বার্থহানি করে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিল না। পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবে দুই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় ঃ একদিকে, কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত বিচ্ছিন্ন জাতীয় অর্থনীতি অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক স্তরে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি।

ভার্সাই চুক্তি প্রণেতারা জার্মানিকে যুদ্ধের জন্য দাবী ঘোষণা করে তার ওপর একপাক্ষিকভাবে ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেয়। কিন্তু ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত সমস্যার নানানদিক সম্পর্কে মিত্রপক্ষের ফ্রান্স ও ইংলন্ডের মতপার্থক্য গুরুতর সংকটের সৃষ্টি করে। ফ্রান্স চেয়েছিল জার্মানির কাছ থেকে সর্বাধিক পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় করে জার্মানিকে দুর্বল করে তুলতে। ইংলন্ড জার্মানিতে তার পণ্যের বাজার নষ্ট করতে চায় নি। সে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ক্ষেত্রে নমনীয় মনোভাব নিয়েছিল।

ক্ষতিপূরণের প্রশ্নের সঙ্গে মিত্রপক্ষীয় শক্তিগুলি আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণের সমস্যাকে যুক্ত করতে চেয়েছিল। মিত্রপক্ষ জার্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে লব্ধ অর্থ দিয়েই আমেরিকাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঋণ মেটাতে চেয়েছিল। কিন্তু মার্কিন সেনেট এ ব্যাপারে তাদের গুরুতর আপত্তি জানায়।

জার্মানি প্রথমদিকে মার্কিনী ঋণের অর্থে ক্ষতিপূরণ দেবার চেষ্টা করে। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্ট্রেসেসম্যানের উদ্যোগে ক্ষতিপূরণের কিস্তি দেওয়া আরম্ভ হয়। অবস্থা যখন স্বাভাবিক হয়ে আসছে সেই সময় মহামন্দার প্রভাবে জার্মানিতে মার্কিন ঋণ দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। জার্মানি ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল সকল দেশের উত্তমর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শেয়ার বাজারে ধ্বস নামে। এই ধ্বসের ধাক্কা গিয়ে লাগে পৃথিবীর সমস্ত দেশের অর্থ ব্যবস্থায়। পৃথিবীর সব দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। একদিকে, আমেরিকাতে শিল্পজাত ও কৃষিজাত উৎপাদনের প্রাচুর্য ও অন্যদিকে চড়া আমদানি শুল্কের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। অধমর্ণ রাষ্ট্রগুলির অর্থ ছিল না, তাই তারা সোনা দিয়ে মার্কিন ঋণ শোধ করার চেষ্টা করে। তার ফলে সমস্ত পৃথিবীর সোনা গিয়ে মার্কিন কোষাগারে জমা হয়। সোনার বিনিময় মূল্য এবং প্রতীকী মূল্য উভয়ই অবলুপ্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণমান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ক্রমে ইয়োরোপের প্রধান দেশগুলি স্বর্ণমান ত্যাগ করে। আন্তর্জাতিক লেনদেন বন্ধ হয়ে যায়।

এই সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের আশ্রয় নেয়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক স্তরে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের পরিবর্তে সংরক্ষণমূলক বাণিজ্যনীতি, দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি, দেশীয় বাণিজ্যকে ভর্তুকি দেওয়া ইত্যাদি নানা কৃত্রিম উপায়ে দেশীয় অর্থনীতিকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। কিন্তু এই স্বার্থপরতা, এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার অনুকূল ছিল না। বিশেষত, জার্মানিতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ এক উগ্র সমরবাদী রূপ নেয়। পৃথিবী দ্বিতীয়বার বিধ্বংসী যুদ্ধের মুখোমুখি হয়।

৩.৬ অনুশীলনী ঃ প্রশ্নাবলি ও উত্তর সংকেত

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ক্ষতিপূরণ সমস্যার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আলোচনা করুন।
উত্তর — ৩.২.৪

২। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ১৯২৯ সালের মহানন্দার প্রভাব আলোচনা করুন।
উত্তর — ৩.৩.২

সংক্ষিপ্ত বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। মহামন্দা বলতে আপনি কী বোঝেন?
উত্তর — ৩.৩.১

২। ক্ষতিপূরণ সমস্যা ও আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণের সম্পর্ক কী?
উত্তর — ৩.৪.১

৩। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ কাকে বলে?
উত্তর — ৩.৪.১

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। জি. এম. গ্যাথোর্ন হার্ডি—এ শর্ট হিস্ট্রি অফ ইন্টারন্যাশানাল অ্যাফেয়ার ১৯২০—৩৯ (১৯৬৮)।
২। স্টিফেন জে. লি. অ্যাসপেক্টশ্ অফ ইয়োরোপীয়ান হিস্ট্রি ১৭৮৯—১৯৮০ (১৯৯৭)।
৩। পি. ফিয়ারসন, দ্যা অরিজিনস্ অ্যান্ড নেচার অফ দ্য গ্রেট স্লাম্প (১৯৯০)।

একক—৪ ❐ দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য
৪.১ প্রস্তাবনা
৪.২.১ উইলসনীয় আদর্শবাদ ও মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি
৪.২.২ বিচ্ছিন্নতাবাদের যুগে বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৪.২.৩ মনরো-নীতি ও পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি
৪.২.৪ দূরপ্রাচ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (ওয়াশিংটন সম্মেলন)
৪.৩.১ সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতিতে আদর্শবাদের (সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের) পর্ব
৪.৩.২ ধনতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে সমঝোতার পর্ব
৪.৩.৩ হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি
৪.৩.৪ গ্র্যাণ্ড অ্যালায়েন্স
৪.৫ সারাংশ
৪.৬ অনুশীলনী ঃ প্রশ্নাবলি ও উত্তরসংকেত
৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন—

- ১৯১৯—১৯৩৯ সালের মধ্যে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি
- ১৯১৯—১৯৩৯ সালের মধ্যে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি

৪.১ প্রস্তাবনা

আমরা ১ এককে ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি ১৯১৭ সালের দুটি ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে : (১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদান (২) রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

যুদ্ধে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট উইলসন ঘোষণা করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করার ফলে যুদ্ধের চরিত্র পাল্টে গেছে। যুদ্ধ আর ক্ষমতালিপ্সু শক্তিগুলির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নয়, যুদ্ধ এখন ন্যায় যুদ্ধ (Justwar) পৃথিবীকে গণতন্ত্রের উপযুক্ত করে তোলার প্রক্রিয়া। যতদিন পৃথিবীতে গণতন্ত্রবিরোধী এবং অগণতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব আছে, ততদিন তারা সর্বক্ষণ আক্রমণাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কখনই যুদ্ধ চায় না। এছাড়া, শান্তিপূর্ণ পৃথিবীতে অস্ত্রের প্রয়োজন কমে যাবে কাজেই বিভিন্ন দেশের উৎপাদন ক্ষমতা সামরিক প্রস্তুতির পরিবর্তে অর্থনৈতিক বিকাশে নিয়োজিত হবে।

লেনিন উইলসনীয় আদর্শবাদকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, এটি ইয়োরোপের বুর্জোয়া (লিবারলিজম) উদারনৈতিকবাদের মতোই ধনতান্ত্রিক অপরাধে আগ্রহী। লেনিনের মতে উইলসন ইয়োরোপীয় শাসকশ্রেণীর মতোই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষিত করতে চান। একমাত্র বলশেভিকরাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে নতুন সমাজের জন্ম দিয়েছে।

উইলসন লেনিনের অভিযোগগুলি সম্পর্কে সচেতনা ছিলেন। তিনি চৌদ্দ দফা ঘোষণার মধ্যে দিয়ে লেনিনের সমালোচনা উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লেনিন চৌদ্দ দফা ঘোষণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছিলেন এই নীতিগুলি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংস্কার করতে পারবে না। রাষ্ট্রসংঘ শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির একটি সংঘমাত্র এবং এই সংঘই বিশ্বরাজনীতির নিয়ন্তা।

তবে ১৯১৭-১৮ সালে মার্কিন আদর্শবাদ ও সোভিয়েত বিপ্লবপন্থার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। উভয় রাষ্ট্রনেতাই আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তার মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্বীকার করেছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কখনই সৌহার্দমূলক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। বিশেষত, ১৯১৮ সালে গ্রীষ্মকালে জাপান পূর্ব সাইবেরিয়া আক্রমণ করে। এই অভিযানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৈন্য পাঠায়। কিন্তু এই অভিযান ব্যর্থ হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যায়। বলশেভিকদের শান্তি সম্মেলনে আহ্বান করা হয়নি।

প্যারিস থেকে উইলসন লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে যোগাযোগ করেন। কিন্তু লেনিন চেয়েছিলেন, এই সাক্ষাৎকারে শুধু বলশেভিকরা থাকবে, আর উইলসন রাশিয়ার সব পার্টির প্রতিনিধির সঙ্গেই মিলিত হতে চেয়েছিলেন। এই সাক্ষাৎকার বানচাল হয়ে যায়।

২৪ বছর পর গভীর সঙ্কটের সামনের দাঁড়িয়ে দুই পক্ষের প্রতিনিধি মিলিত হয়েছিলেন।

৪.২.১ উইলসনীয় আদর্শবাদ ও মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি

উইলসন যেভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য যেভাবে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন, তা পূর্বতন মার্কিন কূটনৈতিকদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। উইলসন মুখ্য শান্তিপ্রণেতার ভূমিকা পালন করতে চেয়েছিলেন, কারণ, তাঁর বিশ্বাস ছিল ইয়োরোপীয়রা তাদের কূটনৈতিক সমস্যা সমাধানে সক্ষম নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুদৃঢ় নেতৃত্ব ও পরিচালনা ছাড়া একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিকাশ পরস্পরের পরিপূরক আবার অভ্যন্তরীণ শান্তি ও আন্তর্জাতিক শান্তি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।

উইলসনের আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের ভিত্তি ছিল আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রাধান্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী বিজয়ী শক্তি ছিল আমেরিকা। ১৯১৪ সালে সে যুদ্ধে যোগদান করেনি, ১৯১৭ সালে সে যুদ্ধে যোগ দিল 'সহযোগী' (associated) শক্তি রূপে, 'মিত্র শক্তি' রূপে নয়। অধ্যাপক ক্রোজিয়ার দেখিয়েছেন, যুদ্ধের ফলে আমেরিকার উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় শতকরা ১৫% বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯১৪ সালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি শক্তিশালী নৌবহর ছিল, ১৯১৮ সালে এই বাহিনী একটি পরিণত বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পুঁজিসংক্রান্ত প্রাধান্য। ১৯১৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বড় উত্তমর্ণ শক্তি আমেরিকার কাছে ইউরোপীয় শক্তিগুলির ঋণের পরিমাণ ছিল ২,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং তার মধ্যে ১০,৩৫০ মিলিয়ন ছিল মিত্রপক্ষীয় ঋণ।

১৯১৬ সালে খুব অল্প ভোটের ব্যবধানে ডেমক্র্যাট উড্রো উইলসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদে নিযুক্ত হন। দুই বছরের মধ্যেই উইলসনের অভ্যন্তরীণ নীতি এবং যুদ্ধের সময় অতিরিক্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণ মার্কিন জনমতকে আহত করে। ১৯১৮ সালে দুটি কক্ষেই রিপাবলিকানরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে।

এছাড়া, বহু নাগরিকই প্যারিসের শান্তি সম্মেলনকে মেনে নিতে পারেনি। কেউ কেউ মনে করেছিলেন জার্মানির প্রতি অত্যন্ত কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কারও মতে ইংলন্ডই সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় নাগরিকরা তাদের নিজ নিজ জাতি স্বার্থসংক্রান্ত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

কাজেই ১৯১৯ সালে উইলসন যখন সেনেটের সামনে ভার্সাই চুক্তি ক্রান্ত বিল পেশ করলেন, এই বিল দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন অর্জন করতে পারেনি। হেনরি ক্যবট লজ (Henry Cabot Lodge) ফরেন রিলেশন্স কমিটির সেক্রেটারি, এই বিল সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। আর রিপাবলিকান উইলিয়াম ই. বোরা (William E. Borah) কোনও আকারেই লীগে যোগদানের বিরোধী ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি উইলসন প্রাণপণে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন লীগের প্রতি দায়িত্ব আইনগত, নয় নৈতিক। কিন্তু যুক্তি কেউই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

৪.২.২ বিচ্ছিন্নতাবাদের যুগে বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : ১৯১৯—১৯৩২

সাধারণত বলা হয়ে থাকে যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি মনরো-নীতির প্রভাবে ক্রমশ বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। এই বিচ্ছিন্নতাবাদকে সরলীকরণ করা উচিত নয়। রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট ঃ উভয়েই আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী ছিল। যদিও আন্তর্জাতিকতায় কিছু পরিমাণে জাতীয়তাবাদী প্রবণতা মিশে ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা খর্বকারী যে কোনো শক্তিকে প্রতিহত করার ঐকান্তিক আগ্রহ মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির মূল আগ্রহ হয়ে ওঠে। ইংলন্ড পশ্চিম এশিয়ায় তৈল খনিগুলি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে আমেরিকা তার বিরোধিতা করে লাতিন আমেরিকায় ইংলন্ডের হস্তক্ষেপে বাধা দেয়, এবং ইঙ্গ-জাপান নৌ-চুক্তি ও ইংলন্ডের সামুদ্রিক প্রাধান্যকে বাধা দেয়। ডেমোক্রাটদের সঙ্গে রিপাবলিকানদের মত পার্থক্যের মূল ক্ষেত্র ছিল—লীগ সনদের শান্তিমূলক ব্যবস্থাগুলির অনুমোদন। ১৯১৮ সালে কংগ্রেস নির্বাচনে রিপাবলিকানরা জয়যুক্ত হয়, তার ফলে সেনেটে ডেমোক্রাটদের প্রাধান্যের অবসান ঘটে। ১৯২০ সালের নির্বাচনে (Warren Hardinge) রিপাবলিকান হার্ডিঞ্জ প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। ১৯১৯ সালের পরবর্তী যুগে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রধান সমস্যা, কংগ্রেস বা নির্বাচকরা বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণকে সমর্থন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তার ফলে, ভার্সাই চুক্তি অনুমোদন ও লীগ অফ নেশনের সদস্য পদ গ্রহণের প্রশ্ন দুটি মার্কিন সেনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করেনি। অথচ নিরস্ত্রীকরণ এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুক্তদ্বার নীতি প্রতিষ্ঠা : এই দুটি ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী উভয়পক্ষের সমান সমর্থন ছিল। দুই পক্ষই মনে করতো দুটি লক্ষ্যপূরণ হলে বিশ্ববাজারে মার্কিন বাণিজ্যের একাধিপত্য বিনা বাধায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাস্তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি অনুসরণ করা সম্ভবও ছিল না। সাগরপারে যে বিপুল পরিমাণ মার্কিন পুঁজি লগ্নি ছিল, সেই পুঁজি রক্ষার দায়িত্ব ছিল। ১৯২৯ সালে ইয়োরোপে প্রত্যক্ষভাবে ১,৩৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পরোক্ষভাবে ৩,০৩০ মিলিয়ান মার্কিন ডলার লগ্নি ছিল। এছাড়া, 'মুক্তদ্বার নীতি'র প্রবক্তারূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব বাণিজ্যে ব্যাপকতর অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিল। পরোক্ষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় রাষ্ট্রকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কূটনীতির মাধ্যমে বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে চেয়েছিল। তবে, একথা অনস্বীকার্য যে, সচেতনভাবে ভার্সাই চুক্তির শর্তগুলি অস্বীকার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক

ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নেতৃত্ব ত্যাগ করেছিল। এই দায়িত্ব পুনরায় ইংলন্ডের হাতে এবং কিছুটা ফ্রান্সের হাতে চলে যায়।

ইয়োরোপ তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেসরকারীভাবে তিনটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছিল। ওয়ার্ল্ড কোর্ট প্রটোকল, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং যৌথনিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণ ক্ষেত্র।

হার্ডিঞ্জের কার্যকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ জনিত সমস্যাসমূহের নিষ্পত্তিতে অতিবাহিত হয়। ১৯২৩ সালে কুলিজ (১৮৭২-১৯৩৩) হার্ডিঞ্জের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, সেনেটের কাছে World Court Protocol অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। তিন বছর ব্যাপী টানাপোড়েনের পর, ১৯২৬ সালে সেনেট পাঁচটি আপত্তিসহ এই প্রটোকল অনুমোদন করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আপত্তিটি ছিল এইরূপ 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ অথবা দাবি জড়িত কোনো বিষয়ে বিশ্ব আদালতে কোনো উপদেশমূলক মত প্রকাশ করা যাবে না। আদালতের সদস্যরা এই আপত্তিটি ছাড়া অন্য আপত্তিটি মেনে নেয়। কারণ, এই আপত্তিটি মেনে নিলে আদালতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবিসম্বাদিত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হত। ১৯২৯ সালে লীগ কাউন্সিল বিচারকদের একটি কমিটিকে কোর্টের নিয়মবিধি সংশোধন করতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যপদ গ্রহণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পর্যালোচনা করতে বলা হয়। এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন (Elihu Root) এলিহু রুট। রুট-পরিকল্পনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিচারালয় উভয় পক্ষেরই গ্রহণযোগ্য হয়। এই পরিকল্পনায় বলা হয়, যদি কখনও বিচারালয়ে মার্কিন যুক্তিরাষ্ট্রের স্বার্থসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপদেশ চাওয়া হয় তবে সে সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারবে। এই মর্মে একটি সিদ্ধান্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ ৫৪টি দেশ স্বাক্ষর করে, কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি শেষ পর্যন্ত বিধিবদ্ধ হয়নি।

আন্তর্জাতিক আদালত ছাড়াও, অন্যান্য বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। সাধারণ বেসরকারী পরিদর্শকের বিভিন্ন সভায় তাদের পরামর্শ জানানোর জন্য প্রেরণ করা হত। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনোমতেই সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেনি।

[৩ এককে আলোচনা করা হয়েছে, কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে জার্মানির ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হয়।] ১৯২৪ সালের চার্লস ডয়েসের নেতৃত্বে গঠিত ডয়েস পরিকল্পনা ১৯২৯ সালে আওয়েন ইয়ং (Owen Young)-এর নেতৃত্বে গঠিত ইয়ং পরিকল্পনা জার্মানির ক্ষতিপূরণ সমস্যার সামরিক সমাধান করতে পেরেছিল।

কিন্তু মিত্র রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধকালীন ঋণের সঙ্গে ক্ষতিপূরণকে যুক্ত করতে চাইলে যুক্তরাষ্ট্র আপত্তি জানিয়েছিল। ১৯২৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহামন্দার ফলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুভার এক বছরের জন্য সব লেনদেন বন্ধ করে দেন। এইভাবে অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করার সাময়িক চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু এই চেষ্টাগুলি ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তী প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাময়িকভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিন আন্তর্জাতিকতার অবসান ঘটে।

যৌথ নিরাপত্তারক্ষা এবং নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯২২ সালে মার্কিন উদ্যোগে সম্পাদিত ওয়াশিংটন সম্মেলন দূরপ্রাচ্যে এবং অন্যত্র সামুদ্রিক ক্ষেত্রে নিবস্ত্রীকরণের জন্য কতকগুলি চুক্তি সম্পাদিত করে। (৪.২.৪ অংশে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) মার্কিন রাষ্ট্রপতি কুলিজের পরামর্শে ১৯২৭ সালে নৌ-শক্তি সীমিত করার জন্য জেনেভা সম্মেলন আহুত হয়। তবে নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মত পার্থক্যের জন্য এই অধিবেশন মুলতুবি রাখা হয়। ১৯২৮ সালে কেলগ-ব্রিঁয়া চুক্তি যৌথ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। ১৯৩০ সালে লন্ডনে আহুত নৌ-সম্মেলনে লীগের বাইরে নৌ-শক্তি হ্রাসের একটি চেষ্টা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতে যোগ দেয়। ১৯৩২ সালে ২ ফেব্রুয়ারি

জেনেভা শহরে আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। কিন্তু, বিভিন্ন নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতা, জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের ফলে আন্তর্জাতিক অবস্থার অবনিত ঘটে। ১৯৩৩ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব নিবস্ত্রীকরণের দ্বিতীয় অধিবেশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগদান করলেও এই সম্মেলন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। ইঙ্গ-মার্কিন নৌ-চুক্তি, জাপান মার্কিন নৌ-চুক্তিগুলি অকার্যকর হয়ে পড়ে।

তা সত্ত্বেও, এই দশকের মার্কিন কূটনীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ইয়োরোপ থেকে সরে আসা। টমাস এন বনারের মতে, "২০-এর দশকে মার্কিনীরা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি বিশিষ্ট লক্ষ্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছিল : কাজের স্বাধীনতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা এবং স্থায়ী মৈত্রী এড়ানোর চেষ্টা ("Americans in the twenties insisted on the unique mission of the United States, the need to maintain independence of action and avoid permanent alliance.") কিন্তু এই নয়া বিচ্ছিন্নতাবাদ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। নতুন প্রযুক্তি, নতুন রাজনীতি এবং পৃথিবীতে ক্রিয়াশীল নতুন সামাজিক ধারা এমন কতকগুলি শক্তিশালী প্রবণতার জন্ম দিয়েছিল যেগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বরাজনীতির আঙিনায় ফিরিয়ে আনে।

৪.২.৩ মনরো-নীতি ও পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি

উনিশ শতকের শেষ থেকে লাতিন আমেরিকায় ইংলন্ডের কূটনৈতিক ও নৌ-শক্তিগত প্রাধান্য দূর করে ১৯১৪ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান বাণিজ্যিক ও পুঁজিবাদী শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। কিউবা, পানামা, হাইতি, ডোমিনিকান রিপাবলিক, নিকারাগুয়া এবং ডেনমার্ক থেকে পাওয়া ভার্জিন দ্বীপে প্রত্যক্ষ মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়েছিল প্রথম বিস্বযুদ্ধের আগেই। ইয়োরোপীয় শক্তিগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়ায় লাতিন আমেরিকায় তাদের অর্থনৈতিক প্রভাব হ্রাস পায়। ২০-র দশকে তারা তাদের হৃত গৌরব উদ্ধার করতে পারেনি।

লাতিন আমেরিকায় ইয়োরোপীয়দের পরাস্ত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য বিস্তার মনরো-নীতির ফল— এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ১৮২৩ সালের ২ ডিসেম্বর কংগ্রেসের উপস্থাপিত প্রেসিডেন্ট জেম্‌শ্‌ মনরোর নীতি ইয়োরোপীয় উপনিবেশিক শক্তিগুলিকে, বিশেষত ফ্রান্সকে দক্ষিণ আমেরিকায় ক্ষমতা বিস্তার করতে নিষেধ করে। সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য ছিল 'আমেরিকা আমেরিকাবাসীর জন্য' (America is for the Americans) উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত মনরো-নীতি ছিল একটি মৃত নির্দেশ মাত্র (dead letter)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমন কিছু শক্তিশালী নৌবহর বা কূটনৈতিক প্রভাব ছিল না, যাতে সে এই নীতিকে কার্যকর করতে পারে। তাছাড়া, পশ্চিমি শক্তিগুলির হস্তক্ষেপ না করার নীতি কখনই চূড়ান্ত ছিল না। ইংলন্ড যখনই সম্ভব হত লাতিন আমেরিকায় সামরিক হস্তক্ষেপ করত। অন্তত চারবার ইংলন্ড লাতিন আমেরিকায় সামরিক হস্তক্ষেপ করেছিল। ফ্রান্স ও স্পেনও পিছিয়ে ছিল না। এই প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ বাদ দিলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংলন্ড, ফ্রান্স ও জার্মানি এই অঞ্চলের অর্থনীতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

১৮৯০-এর পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রথম শ্রেণীর শিল্পভিত্তিক শক্তি হিসেবে পশ্চিম গোলার্ধের উত্তরে নিজের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। মার্কিন কূটনৈতিকরা প্রধানত দুটি নৈতিকতার দাবীতে পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন প্রভাব বিস্তার করেছিল : গোলার্ধের সংহতি ও নিখিল মার্কিনবাদ (hemispheric solidarity, Pan Americanism)।

নিখিল মার্কিনবাদের ভিত্তি ছিল দুটি ভুল ধারণা : (১) দুই আমেরিকা ভৌগোলিকভাবে একই এককের অন্তর্গত। একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ডের দ্বারা যুক্ত হলেও দুই আমেরিকার যোগাযোগ হ'ত জলপথে বা বায়ুপথে। রিওডিজ্যানিয়েরো থেকে আফ্রিকা নিকটতর আর ওয়াশিংটন থেকে বুয়েনস এরসের তুলনায় মস্কো অনেক কাছে। (২) ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলিকে 'ভগ্নী প্রজাতন্ত্র' বলে অভিহিত করা হলেও, কার্যত প্রজাতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রাচীন বিশ্বে (Old World) কখনই দৃঢ়মূল হতে পারেনি। তুচ্ছ বাধায় প্রজাতন্ত্রগুলি কোনো না কোনো রকমের একনায়কতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল।

তা সত্ত্বেও, ১৮৮৯ সালে International Conference of American States নামক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রবল পরাক্রান্ত উত্তরের আমেরিকার সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার দুর্বল রাষ্ট্রগুলির নয়া উপনিবেশবাদী সম্পর্ককে নিখিল মার্কিনবাদের মোড়কে উপস্থাপিত করা হয়েছিল, (১৯০৪ সালে প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট বলেন "Chronic wrongdoing, or an impotence which results in a general loosening of the ties of civilized societies" may in America, as elsewhere, ultimately require intervention by some civilized nation, and in the western hemisphere where the adherence of the United States to the Monroe Doctrine may force the United States, however, reluctantly, in flagrant cases of such wrongdoing or impotence to the exercise of an international police power"। তাঁর বিখ্যাত সংযোজনে ল্যাটিন আমেরিকায় ইয়োরোপীয় হস্তক্ষেপের ওপর নিষেধাজ্ঞাকে নতুনভাবে আরোপ করা হয় এবং আলোচ্য অঞ্চলে পুলিশিনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক কেলরের মতে ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিন নীতির দুটি পর্যায় লক্ষনীয় : (১৯১৪-৩২) প্রত্যক্ষ আধিপত্যের পর্যায় এবং (১৯৩৩-৪৫) পরোক্ষ আধিপত্যের পর্যায়।

১৯১৪ সালের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'ডলার কূটনীতির' সাহায্যে দক্ষিণ আমেরিকার সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবলভাবে হস্তক্ষেপ করে। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা উড্রো উইলসন ক্যারিবিয়ান প্রজাতন্ত্রগুলিতে ব্যাপক অসাধুতা, অযোগ্যতা, স্বৈরতন্ত্র এবং সামাজিক অস্থিরতা দূর করে শৃঙ্খলা, সততা এবং যোগ্যতা প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। এই আদর্শ ঘোষণার আড়ালে ইতিহাসের অমোঘ পরিহাসে তিনি পূর্বতন রুজভেল্ট টাফ্ট নীতি পুনপ্রবর্তিত করেন।

ল্যাটিন আমেরিকায় বিপুল পরিমাণ মার্কিন পুঁজি বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করার জন্য ১৯১৯ সালে Edge Act পাস হয়। মার্কিন ব্যাঙ্কগুলি বিদেশে শাখা খোলার অনুমতি লাভ করে। ফলে, ল্যাটিন আমেরিকার বিশাল পুঁজির বাজারের দরজা মার্কিন বিনিয়োগকারীদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়। ২০-র দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ল্যাটিন আমেরিকায় মোট মার্কিন পুঁজির প্রায় ২৪% লগ্নি হয়. অনতিবিলম্বে লগ্নির পরিমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। রেলপথ, বিদ্যুৎ, খনি, পেট্রোলিয়াম শিল্প ও বাগিচা শিল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশী বিনিয়োগের শতকরা ৪৪% বিনিয়োজিত হয়।

দুই আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যিক বিনিময় এক নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের জন্ম দেয়। চিলির তামাখনির ৯২% পুঁজির মালিক ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভেনেজুয়েলার পেট্রোলিয়াম পণ্যের অর্ধেক মার্কিনীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আমেরিকার United Fruit Company ও Standard Fruit Company গুয়াতেমালা, হণ্ডুরাস, নিকারাগুয়া ও পানামার কলা চাষের একচেটিয়া মালিকানা ভোগ করত। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি দেশে একটি পণ্যকেই পৃষ্ঠপোষকতা দান করত। দ্রুত মূল্যহার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের উৎপাদকেরা

তীব্র আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। তৃতীয়ত, ১৯৩৭ সালের পর থেকে আমেরিকা কিউবার ৮০% রপ্তানিজাত দ্রব্য, হণ্ডুরাসের ৮৮%, পানামার ৮১% পণ্য ক্রয় করত। মার্কিন বাজারের ওপর চূড়ান্ত নির্ভরতার ফলে এই দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি পুরোপুরি মার্কিন নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

মার্কিন আধিপত্যকে প্রতিহত করতে গেলে ল্যাটিন আমেরিকাকে সংঘবদ্ধ হতে হত। ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় অর্ধেক ভূখণ্ড এবং এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত ব্রাজিল নেতৃত্বের যোগ্য ছিল। কিন্তু ব্রাজিল ল্যাটিন আমেরিকার প্রাশিয়া হয়ে উঠতে পারেনি। সে বরং আমেরিকার প্রধান তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল, কারণ আমেরিকাই ছিল ব্রাজিলের কফির প্রধান খরিদ্দার।

আর্জেন্টিনার স্বাধীন সত্তা তাকে ক্রমশ ওয়াশিংটনের প্রধান শত্রু করে তোলে। দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থান হওয়ায় আর্জেন্টিনা সহজে মার্কিন সামরিক ও নৌশক্তিকে ভয় পায়নি। দ্বিতীয়ত, গরুর মাংস ও শস্য ব্যবসায় সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। তৃতীয়ত, ১৯৩৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মাত্র ১৬.১% পণ্য আমদানি করেছিল, অথচ ইয়োরোপ থেকে তার আমদানির পরিমাণ ছিল ৫৯.১%। চতুর্থত, আর্জেন্টিনায় বসবাসকারী জার্মান ও ইতালীয়রা তাদের মাতৃভূমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখত। আর্জেন্টিনা নিখিল মার্কিনবাদের বিপরীতে নিখিল স্পেনবাদ তুলে ধরে। এবং কালভো নীতির মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করে দেয়।

অধিকাংশ ল্যাটিন আমেরিকান প্রজাতন্ত্র জাতিসংঘে যোগদান করে। ২০-র দশকে এদের অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা এক থেকে বেড়ে হয় তিন। কিন্তু তারা লীগকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগের সদস্য না হয়েও আমেরিকা মহাদেশের ক্ষেত্রে ২১ নম্বর ধারা প্রয়োগের নির্দেশ দেয়— এই ধারা অনুসারে মনরো নীতির অধীনস্থ দেশগুলির ওপর লীগের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। ল্যাটিন দেশগুলি এই ধারাটি বাতিল করার চেষ্টা করলেও ইয়োরোপীয় সদস্যরা মার্কন যুক্তরাষ্ট্রকে আহত করতে পারেনি।

বিশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ল্যাটিন আমেরিকায় কোনো বৈদেশিক শক্তির প্রভাব বিস্তার নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃহৎ যষ্ঠি (Big Stick Policy) নীতির পরিবর্তে অর্থনৈতিক আধিপত্যের নীতি অনুসরণ করেছিল। তা সত্ত্বেও ১৯২৮ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের ষষ্ঠ সম্মেলনে মার্কিন প্রতিনিধি চার্লস ইভান্‌শ্‌ ইউজেস ল্যাটিন আমেরিকায় অভ্যন্তরীণ শাসন ভেঙে পড়লে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অধিকার দাবি করেন।

দ্বিতীয় পর্ব : ১৯৩১ সালে জাপানের মঞ্চুরিয়া আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিনি সামরিক হস্তক্ষেপনীতি যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলেছিল। হুভারের কার্যকালে আন্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেট রিউবেন ক্লার্ক মনরো নীতির সঙ্গে যুক্ত রুজভেল্ট করোলারি বাতিল করে দেন।

১৯৩৩ সালের ৪ঠা মার্চ ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট সৎ প্রতিবেশী নীতি (Good Neighbour policy) ঘোষণা করেন। ১৯৩৩ সালে মন্টিভিডিওতে আহুত সপ্তম সম্মেলনে 'সৎ প্রতিবেশী নীতি' গৃহীত হয়। কর্ডেল হাল কালভোনীতি স্বীকার করে নেন। একের পর এক রাষ্ট্র থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাত উঠিয়ে নেয়। নিকারগুয়া ও হাইতি থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারিত হয়। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপও প্রত্যাহৃত হয়।

কিন্তু মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির এই পরিবর্তন নিতান্তই বাহ্যিক। স্থানীয় রাজনৈতিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক এলিটদের সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে তার প্রাধান্য বজায় রাখে। ব্যাঙ্ক ও স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলি মার্কিন সরকারের অর্থ সাহায্য লাভ করে।

মহামন্দার পরিপ্রেক্ষিতে ল্যাটিন আমেরিকার কাঁচামাল ও বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তি ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রাধান্য প্রবক্তা হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, অনুগত ল্যাটিন আমেরিকার রাজ্যগুলির সমর্থন সে পশ্চিম গোলার্ধের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে. ১৯৩৬ সালের ৩০ জানুয়ারি রুজভেল্ট এই উদ্দেশ্যে দুই আমেরিকার রাজ্যগুলির একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। কিন্তু আর্জেন্টিনী প্রতিনিধিরা ইয়োরোপীয় নিরাপত্তার প্রশ্নের সঙ্গে পশ্চিম গোলার্ধের নিরাপত্তাকে যুক্ত করেন। মিউনিখ সম্মেলনের পরবর্তী যুগে আহূত ল্যাটিন আমেরিকার সম্মেলনগুলিতে অক্ষশক্তির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দুই মহাদেশের নিরাপত্তা রক্ষা এবং সংহতি বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়—পাশাপাশি ল্যাটিন আমেরিকার ওপর মার্কিন অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়তর হয়ে ওঠে।

৪.২.৪ দূর প্রাচ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। জাপান বুঝতে পারে চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে গেলে মার্কিন প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হবে। তাই জাপান জানিয়ে দেয় আত্মরক্ষা ছাড়া চীনে তার অন্য কোনো স্বার্থ নেই। চীন আমেরিকাকে উইলসনীয় মুক্ত রাজনীতির প্রতিনিধি রূপে দেখতে চেয়েছিল। মার্কিন কূটনৈতিক মহলে পূর্ব এশিয়ায় জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য ছিল রুজভেল্টের মতে, জাপান এশিয়া ও প্রশান্তসাগর অঞ্চলে মার্কিন নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে, তার বিরুদ্ধে দুর্বলচীনকে সমর্থন করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। অন্যপক্ষের মতে মার্কিন আদর্শবাদ অনুসারে চীনকে সাহায্য করা উচিত। ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর স্বাক্ষরিত 'Lansing Ishi' চুক্তি অনুসারে চীনের সীমানাভুক্ত মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের স্বার্থ স্বীকার করে নেওয়া হয়। তবে জাপান চীনের সংহতি নষ্ট করলে অথবা মুক্তদ্বার নীতির প্রয়োগে বিঘ্ন ঘটালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

চীনে চাপানের বিশেষ স্বার্থের তাৎপর্য মনরো-নীতির অনুরূপ একটি নীতি। ইতিমধ্যে বলশেভিক বিপ্লবের ফলে পূর্ব এশিয়ায় জাপান অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। প্যারিসের শান্তিচুক্তিতে জাপান চীনের শান্টুং প্রদেশে অর্থনৈতিক প্রাধান্য লাভ করে। শান্তিচুক্তিতে জাপানের ভৌমিক ও অর্থনৈতিক লাভ এবং সামরিকখাতে ব্যয় বৃদ্ধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।

জার্মানির নিরস্ত্রীকরণের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব এশিয়ায় শক্তিবিস্তারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তবে প্রথম দিকে জাপান ও আমেরিকা উভয়পক্ষই সামরিক সংঘর্ষের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ উপায়ে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী ছিল।

১৯২১ থেকে '২২ সালের শীতকালে নৌশক্তি হ্রাস করার জন্য ইয়োরোপীয় প্রতিনিধিরা ওয়াশিংটনে মিলিত হয়। '২২ সালে স্বাক্ষরিত পাঁচ শক্তি চুক্তিতে ইংলন্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালির নৌশক্তির অনুপাত স্থির হয় যথাক্রমে ৫ : ৫ : ৩ : ১.৭৫ : ১.৭৫ (১০,০০০ টন ভারী কামানবহনকারী জাহাজ)। দ্বিতীয়ত, তিনটি প্রধান নৌশক্তি প্রশান্ত সাগর অঞ্চলে দুর্গ না গড়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। জাপান শান্টং প্রদেশে চীনা সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ও ১৯২৩ সালের ১৭ আগস্ট যথাক্রমে নয়শক্তি ও চতুঃশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই দুটি চুক্তিতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারসাম্য বজায় রাখার এবং চীনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

তবে ওয়াশিংটন ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। জাপানের অনুমান, ওয়াশিংটন ব্যবস্থায় নিকট প্রাচ্যে জাপানের অগ্রগতি খর্ব করে পাশ্চাত্য ইয়োরোপীয় শক্তিগুলির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। অবিলম্বে, জাপান-ওয়াশিংটন চুক্তি

প্রবর্তিত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করতে প্রস্তুত হয়। ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলে জাতিসংঘ যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে জাপানকে প্রতিহত করতে পারেনি।

অধ্যাপক কেলরের মতে ওয়াশিংটন সম্মেলনের পর থেকে জাপানের ব্যাপারে মার্কিন ভীতি দূর হয়। সে জাপানের তুলনায় বেশি যুদ্ধজাহাজের অধিকারী হয়ে ওঠে। পূর্ব সাইবেরিয়া থেকে জাপানি প্রাধান্য দূর হয়। এছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমেই জাপানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় করে তুলতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। '২০-র দশকে জাপানের মোটরগাড়ি, যন্ত্রপাতি, বাড়ি তৈরির সরঞ্জাম এবং তেলের চাহিদা সবটাই মেটাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। জাপানের মোট রপ্তানির শতকরা ৪০ ভাগই যেত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাছাড়া, জাপানে নিয়োজিত বিদেশী পুঁজির শতকরা ৪০% সরবরাহ করত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন কংগ্রেস পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ সেনা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় অর্থ অনুমোদনে রাজি ছিল না। এই সকল কারণে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি হুভার জাপানের বিরুদ্ধে কোনোরকম অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চাইলেন না। তবে, পররাষ্ট্র সচিব হেনরি স্টিমসন (১৯২৩ সালের ৭ জানুয়ারি) একটি বার্তার মাধ্যমে জাপান সরকারকে জানান যে কেলগ-ব্রিঁয়া চুক্তি বিরোধী কোনো পদক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মেনে নেবে না।

পরবর্তী রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট নিউডিল নিয়ে ব্যক্ত থাকায় তাঁর পক্ষে বিদেশ নীতির দিকে নজর দেওয়া সম্ভব ছিল না। ইতিমধ্যে ১৯৩৫ সালের নিরপেক্ষতা আইন (Neutrality Act.) বিবাদমান পক্ষগুলিকে অস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ করে এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অর্থদান বাধ্যতামূলক করে দেয়। এর ফলে, ১৯৩৯ সালে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর পশ্চিমি শক্তিগুলি মার্কিন ঋণ লাভে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে, তাদের ক্ষীয়মান স্বর্ণ ও ডলার ভাণ্ডার অটুট রাখার জন্য ইংলন্ড ও ফ্রান্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানির পরিমাণ হ্রাস করতে বাধ্য হয়। মার্কিন জনমত ক্রমে ইঙ্গ-ফরাসি স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠায় অস্ত্র রপ্তানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে বেরিয়ে আসে। ১৯৩৭ সালে চীন জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় রুজভেল্ট 'শান্তি সংরক্ষণে ইতিবাচক পদক্ষেপ' গ্রহণের সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে নানা মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। অবশেষে ১৯৩৯ সালের ২৬ জুলাই জাপান-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি (১৯১১) বাতিল করার জন্য জাপানকে ছয় মাসের নোটিশ জারি করা হল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণ-দামামা বেজে উঠল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইয়োরোপের দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

নয়া-বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি ত্যাগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুগপৎ ইয়োরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা এবং দূর প্রাচ্যে আগ্রাসী একনায়কতান্ত্রিক শক্তিগুলির অগ্রগতি রোধ করার জন্য একদিকে পশ্চিম গোলার্ধ ও প্রশান্ত সাগর অঞ্চলে নিজের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করল এবং অন্যদিকে পশ্চিমের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানায়।

৪.৩.১ সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতিতে আদর্শবাদের পর্ব

জারতান্ত্রিক পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য, জারতান্ত্রিক পররাষ্ট্রনীতি আক্রমণাত্মক এবং সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি মূলত রক্ষণাত্মক। সোভিয়েত রাষ্ট্রের দুটি দায়িত্ব : নবজাত বিপ্লবকে রক্ষা এবং গৃহযুদ্ধে জয়লাভের পর হাঁফছাড়ার অবকাশকে (breathing space) দীর্ঘায়িত করা।

১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লব রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ইতিহাসে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এক প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। এর কারণ দুটি : এক, পাশ্চাত্য শক্তিগুলির বিরুদ্ধে বলশেভিকদের তীব্র মতাদর্শগত ঘৃণা এবং দুই, পাশ্চাত্য শক্তিগুলির পতন সম্পর্কে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার পতন প্রকারান্তরে